যুগদেবতা রামকৃষ্ণ

মণি বাগচী

যুগদেবতা রামকৃষ্ণ

মণি বাগচি

: পরিবেশক :

শৈব্যা পুস্তকালয় ● ৮।১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রকাশক :
রবীন বল
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

দামঃ পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬
(শোভন সংস্করণ : ৮০০)

ভূমিকা

রামকৃষ্ণ যুগাবতার।
তাঁর সময় থেকেই ভারতবর্ষের ধর্ম জগতে নব যুগের সূচনা।
তাঁরই কণ্ঠে আমরা প্রথম শুনলাম যত মত, তত পথ। তাঁরই অলৌকিক সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে আমরা এক পরম বাণীর সন্ধান পেলাম:
যেখানে জীব, সেখানেই শিব।
তিনি এসেছিলেন এক নতুন জীবন চেতনা নিয়ে। সেই চেতনার আলোকেই আলোকিত হয়ে উঠেছে আমাদের যুগ ও জীবন। এই মহামানবের জীবন কথা অমৃত সমান, এই কথাটি মনে রেখেই তোমরা এই বইটি পড়বে।

মণি বাগচি

৯০ বাগুইআটি রোড
কলিকাতা ২৮

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব

বহু সাধকের
বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার
মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে
অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ
রূপ নিল এ জগতে।

—রবীন্দ্রনাথ—

এক

জানবাজারের রাণী রাসমণি। বিষয়কর্মে যেমন বুদ্ধি তাঁর, তেমনি তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাস। তেমনি দেব-দ্বিজে ভক্তি। আবার গরীবের মা-বাপ তিনি। দু'হাতে অন্নদান করে থাকেন। জাতে কৈবর্ত্ত হলেও হিন্দু সমাজে বিপুল প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন।

রাণীর একবার ইচ্ছে হলো কাশী যাবেন তিনি। সেখানে দর্শন করবেন বিশ্বেশ্বর আর অন্নপূর্ণা। এ ইচ্ছে তাঁর অনেক দিনের। এইজন্য অনেক দিন থেকে তিনি অনেক টাকা জমিয়েছেন। তীর্থ দেখবেন, সেখানে গিয়ে দান-ধ্যান করবেন। রাণীর ছেলে নেই। চার মেয়ে। সকলেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তৃতীয় জামাই মথুরানাথ ঠিক তাঁর ছেলের মতো।

একদিন রাণী জামাইকে ডেকে বললেন, বাবা মথুর, কর্তা থাকতেই কাশী দেখার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু তিনি মারা গেলেন; তীর্থ করা হলো না। এবার আমি বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাব, মনস্থ করেছি। তুমি সব ব্যবস্থা করো। তখন মথুরানাথ আয়োজন করতে লাগলেন। রাণী রাসমণি কাশী যাবেন, এতো চাট্টিখানি কথা নয়। সেই রকম

আয়োজনই হলো। যাবার দিনও ঠিক হয়েছে। যাত্রার ঠিক আগের দিন, রাত্রিবেলায় রাণী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন।

স্বপ্ন দেখলেন, এক দিব্য কালীমূর্তি তাঁর সামনে এসে তাঁকে যেন বলছেন: কাশী যাবার দরকার নেই। এখানে গঙ্গার ধারে ভালো জায়গায় একটা মন্দির করে, আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করো—সেখানে নিত্য পূজো ও ভোগের ব্যবস্থা করো। আমি ঐ মূর্তির মধ্যে আবির্ভূতা হয়ে সেই পূজো গ্রহণ করবো।

বিচিত্র স্বপ্ন! অদ্ভুত প্রত্যাদেশ! পরের দিন সকালবেলায় মথুরানাথ এসে রাণীকে বললেন, মা, আয়োজন সব প্রস্তুত। পুরুতমশাই বলেছেন আর কয় দণ্ড পরেই যাত্রার শুভক্ষণ। একশো খানা নৌকা সঙ্গে যাবে।

—মথুর, আমি কাশী যাব না।

—যাবেন না!

—না। কাল রাতে আমি স্বপ্নে মায়ের আদেশ পেয়েছি। তুমি আজ থেকে গঙ্গার ধারে জমি দেখতে আরম্ভ করো। আমি এখানে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করব।

রাসমণির তীর্থযাত্রা বন্ধ হয়ে গেল।

গঙ্গার তীরে উপযুক্ত জমি খুঁজতে লাগলেন মথুরবাবু। অনেক অনুসন্ধানের পর অবশেষে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে গঙ্গার তীরে পাওয়া গেল মনের মতো জমি। কচ্ছপের পিঠের মতো সেই জমি। রাণীর খুব পছন্দ হলো। কলকাতার কাছেই গঙ্গার তীরে কেনা হলো ষাট বিঘা জমি। সেই জমির ওপর বিপুল অর্থব্যয়ে মন্দির তৈরির কাজ আরম্ভ হলো এক শুভদিনে। দেখতে দেখতে সেখানে নবরত্ন পরিশোভিত এক বিরাট মন্দির মাথা তুলে দাঁড়ালো। অপূর্ব তার কারুকার্য। এইটা হবে দেবীর মন্দির। তার পাশেই তৈরি হয় রাধাকান্তের মন্দির। নাটমন্দির ও বারটি শিবের মন্দির তৈরি হলো। জয়পুর থেকে এক সুদক্ষ কারিগর আনানো হলো। সেই শিল্পীকে

দিয়ে গড়ানো হলো ভবতারিণী আর রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। একটি বাক্সের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল সেই মূর্তি তিনটি। এক রাত্রে রাণী আবার স্বপ্ন দেখলেন : মা যেন বলছেন, বাক্সের মধ্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। শিগ্‌গীর আমাকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করো।

তখন আষাঢ় মাস। সামনেই রথযাত্রা। রাণী ঠিক করলেন এই পুণ্য তিথিতেই তিনি মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। জগদম্বাকে অন্নভোগ দেওয়ার জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। মনের মতো মন্দির তৈরি হয়েছে। নিত্য সেবাপূজার জন্য যথেষ্ট সম্পত্তির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। লোকে বলবে, রাণী রাসমণি কতবড়ো কীর্তি রেখে গিয়েছেন।

মা, আমি নাম যশ চাই না। তুমি এই মন্দিরে নিত্য প্রকাশিত থাক—এই আমার অন্তরের অভিলাষ। এই কথা ভাবেন রাসমণি। আবার পর মুহূর্তে তাঁর অন্তর বিষাদে ভরে ওঠে। কিসের জন্য বিষাদ ? যদি নিত্য অন্নভোগ দিতে না পারেন! তবে এত আয়োজন, এত অর্থব্যয় সবই বৃথা হয়ে যাবে।

মন্দির তৈরি হলো। সুন্দর কারুকার্যশোভিত নবরত্ন মন্দির। অনেক টাকা খরচ করে দেবীর মূর্তিও গড়িয়ে আনা হয়েছে। বাকী এখন প্রতিষ্ঠা। তিনি যে কৈবর্তের মেয়ে, কৈবর্তের ঘরের বৌ। তাঁকে এজন্য ব্যবস্থা নিতে হবে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছ থেকে। তিনি যে দেবীকে অন্নভোগ দেবেন—এ ব্যবস্থাতো তাঁদেরই দিতে হবে। এই শাস্ত্রের বিধি। এই প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কাজ করার অধিকার তাঁর নেই। যদি তা করেন তাহলে কি ভক্ত, কি ব্রাহ্মণ, কেউ তো এই মন্দিরের ছায়া মাড়াবেন না—প্রসাদ গ্রহণ তো দূরের কথা!

তবে উপায় ? রাসমণির চিন্তার শেষ নেই। জামাইকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, মথুর, পণ্ডিতদের কাছ থেকে ব্যবস্থাপত্র আনাবার ব্যবস্থা করো।

—ব্যবস্থাপত্রের দরকার কি, মা ? আপনার ভক্তিতে আপনি

প্রতিষ্ঠা করেছেন এই মন্দির। আপনি ভক্তিভরে মায়ের অন্নভোগ দেবেন এর জন্যে আবার বামুনদের খোসামোদ করা কেন?

—তা হয় না, মথুর। আমরা কৈবর্ত, আমাদের দেবীকে অন্নভোগ দেবার অধিকার নেই। শাস্ত্রের যা বিধি তা আমাকে মানতেই হবে। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকেই আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বুদ্ধিমতী রাণীর কথায় মথুর বিস্মিত হলেন। তাঁর সেই বিস্ময় পরিণত হয় শ্রদ্ধায়। তিনি তখন সেইমতো কাজ করলেন। চারদিকে তাঁর লোক ছুটলো ব্যবস্থাপত্রের জন্য। বাংলা ও বাংলার বাইরে সকল নামকরা পণ্ডিতের কাছে ব্যবস্থা চেয়ে পাঠানো হলো। নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর, কাশী—সর্বত্র রাণীর লোক ছুটলো। কৈবর্তের মেয়ে দেবীর অন্নভোগ দেবেন! সে কি করে হয়? যিনি এই কথা শোনেন, তিনিই ঘাড় নাড়েন। বলেন—না, অন্নভোগ দেওয়া চলবে না। কোনো সদাচারী বামুনই কৈবর্ত-পূজিত দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করবেন না। এই ব্যবস্থাই আসতে লাগলো চারিদিক থেকে। মথুর রাণীকে পড়ে শোনান সেসব ব্যবস্থাপত্র। ভক্তিমতী রাণী নিরাশ হলেন না। মা নিশ্চয়ই একটা উপায় করবেন। এই বিশ্বাসে তিনি অটল রইলেন।

সব জায়গা থেকে ব্যবস্থাপত্র তখনো পর্যন্ত যোগাড় করা হয় নি। দ্বিগুণ উৎসাহে রাণীর লোকজন আবার ছুটলো নানা স্থানে। দিন যায়। রাণীর উৎকণ্ঠার শেষ নেই। মা, তুমি কি আমার দেওয়া অন্ন ভোগ গ্রহণ করবে না—শুধু এই একটি প্রশ্ন দিনরাত উঠছিল তাঁর অন্তর থেকে! এদিকে রথযাত্রার দিনও আসন্ন। দক্ষিণেশ্বরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার খবরটা এর মধ্যে বাংলার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। একদিন মথুর এসে বললেন, মা এতদিনে বুঝি আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো।

—পেয়েছ মথুর, ব্যবস্থা পেয়েছ? কে বিধান দিলেন?

—ঝামাপুকুরের টোল থেকে পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য।

—কি ব্যবস্থা দিয়েছেন তিনি ?

মথুরানাথ পড়লেন : রাণী যদি তাঁর গুরুদেবের নামে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে অন্ন ভোগ দেওয়ার কোনো বাধাই নেই, আর সেই প্রসাদ গ্রহণ করলে কারো দোষ হবে না। প্রতিষ্ঠার আগে তাঁর গুরুদেবের নামে মন্দিরের যাবতীয় সম্পত্তি লিখে দিতে হবে। তখন অন্ন ভোগের ব্যবস্থা করলে শাস্ত্রীয় নিয়ম বজায় থাকবে।

রাণীর উৎকণ্ঠার অবসান হলো। দেবী ভবতারিণী তাহলে প্রসন্ন হলেন। আর সাতদিন বাদেই রথযাত্রা। ব্যবস্থা পাওয়া গেল, কিন্তু আর একটা বাধা এসে উপস্থিত হলো। কোনো শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ পূজো করতে রাজী হলেন না। কারণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাত্রী জাতিতে কৈবর্ত। মথুর বললেন, মা, পূজোর জন্য তো কোনো ব্রাহ্মণ পাচ্ছি না। তখন রাসমণি তাঁকে বললেন, যিনি ব্যবস্থা দিয়েছেন সেই ভট্টাচার্যি মশাইকে অনুরোধ করে তুমি লোক পাঠাও।

রাসমণির লোক এলো একদিন ঝামাপুকুরের টোলে। এমন উদার ব্যবস্থাদান যিনি করতে পারেন, তিনিই তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠার পুরুতের কাজ করার উপযুক্ত, এই ছিল ভক্তিমতী রাণীর বিশ্বাস। তাঁর অনুরোধ বৃথা হলো না। রামকুমার মন্দির-প্রতিষ্ঠা কাজে আনন্দে ব্রতী হতে সম্মত হলেন। শুভ রথযাত্রার দিনে রাণীর সংকল্প পূর্ণ হলো। এতদিনে চরিতার্থ হয় তাঁর সেই স্বপ্ন—সেই দৈব আদেশ। শুভদিনে শুভক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হলেন দেবী ভবতারিণী রাসমণির তৈরি নবরত্নবিশিষ্ট সেই মন্দিরে। স্থাপিত হলো গঙ্গার তীরে এক নতুন তীর্থ—মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বর।

মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব তো নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। কিন্তু আর একটা বিঘ্ন এসে উপস্থিত। নিত্য পূজার জন্য যজন-যাজনক্ষম কোনো ব্রাহ্মণ পাওয়া গেল না। কাকে এখন পূজারীর পদে নিয়োগ করা যাবে ? অবশেষে রাণীর অনুরোধ-পত্র নিয়ে আবার লোক এলো রামকুমারের কাছে। 'সুযোগ্য পূজক না পাওয়া পর্যন্ত আপনি

অনুগ্রহ করে পূজকের আসন গ্রহণে স্বীকৃত হোন'—এই ছিল রাণীর অনুরোধ।

জগদম্বার অর্চনা বন্ধ হবে?

চিন্তা করলেন রামকুমার।

দেবীভক্ত রামকুমার রাণী রাসমণির এই অনুরোধের মধ্যে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাকে যেন প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দেবী ভবতারিণীর পূজকের পদ গ্রহণ করলেন। নিঃশব্দে হিন্দু সমাজে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। যে পীঠস্থান থেকে একদিন ভবিষ্যতে 'যত মত, তত পথ' এই উদার বাণী বিশ্বের ধর্মজগতে ছড়িয়ে পড়বে, সেইখানে ১৮৫৫ সালের ৩১শে মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই মন্দির।

এই মন্দিরেরই পূজারী ছিলেন রামকৃষ্ণ। তিনি রামকুমারের সহোদর।

দুই

হুগলী জেলায় কামারপুকুর।

এইখানে বাস করতেন ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। শুদ্ধাচারী গরীব বামুন। রঘুবীরের উপাসক। যেমন সত্যবাদী তেমনি ধার্মিক। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় নিষ্ঠাভরে ইষ্টদেবতার অর্চনা করতেন। সকল দেবদেবীতেই তাঁর ভক্তি। তাঁর স্ত্রী চন্দ্রমণিও ভক্তিমতি নারী ছিলেন। ক্ষুদিরামের তিন ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলের নাম রামকুমার, মেজ রামেশ্বর, কনিষ্ঠ গদাধর। কাত্যায়নী বড় মেয়ে, ছোট মেয়ে সর্বমঙ্গলা।

ক্ষুদিরাম যজন-যাজন করতেন, তবে শূদ্রের বাড়ি পূজা করতেন না, কিম্বা শূদ্রের দান গ্রহণ করতেন না। নির্লোভ নিষ্ঠাবান এই ব্রাহ্মণকে গ্রামের সকলেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতো। তাঁর স্ত্রী চন্দ্রাদেবী যেন দয়া ও সরলতার প্রতিমা। তাঁর আপন পর বোধ ছিল না। তিনি যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। ক্ষুধিত ও অভুক্ত অতিথিদের নিজের মুখের অন্ন তুলে দিয়েও সেবা করতেন। এমন অনেক দিন গিয়েছে যখন সমাগত অতিথিকে নিজের ভাতের থালা ধরে দিয়ে, চন্দ্রাদেবী

সামান্য মুড়ি খেয়ে অথবা একেবারে উপোস করে কাটিয়েছেন। ক্ষুদিরামের কুঁড়ে ঘরে গৃহ-দেবতা রঘুবীরের যেমন নিত্য পূজা হতো, তেমনি প্রতিদিন অতিথি-অভ্যাগতদের সেবা ছিল বাঁধা। সবাই বলতো, ক্ষুদিরামের সংসার যেন ধর্মের সংসার, শিবের সংসার।

গদাধরের জন্মের ঠিক আগে ক্ষুদিরাম তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন। কাশী হয়ে তিনি এলেন গয়াধামে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতে। অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর তীরে গয়াতীর্থ। তীর্থ নয়, তীর্থরাজ! বিষ্ণুর পাদপদ্ম ধারণ করেই তো গয়া হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। এইখানে বিষ্ণু মন্দিরে এক রাতে নিদ্রাকালে ক্ষুদিরাম এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন।

স্বপ্ন দেখলেন—এক দিব্যজ্যোতিতে মন্দির ভরে গেছে। তাঁর পিতৃ-পুরুষরা দুই সারি দিয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে এক দিব্য পুরুষের উপাসনা করছেন। কী তাঁর রূপ! নবদূর্বাদলশ্যাম তনু। জ্যোতির্ময়। সহাস্য বদনে তিনি তাকালেন ক্ষুদিরামের দিকে, ইঙ্গিতে ডাকলেন তাঁকে। যন্ত্রের মতো পরিচালিত হয়ে তিনি যেন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের কাছে উপস্থিত হলেন। বিনীত ভাবে নানা রকম স্তবস্তুতি করলেন। তখন ঐ দিব্য পুরুষ সহাস্যে বললেন, আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়েছি, ক্ষুদিরাম। আমি পুত্ররূপে তোমার ঘরে জন্ম নেব, তোমার সেবা গ্রহণ করবো।

সমস্ত শরীরটা যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো ব্রাহ্মণের। আবিষ্টের মতো তিনি বললেন, প্রভু, আমি দরিদ্র! কোনো দিন খেতে পাই, কোনো দিন পাই না। তুমি পুত্ররূপে আমার ঘরে আসবে, সে যে আমার শত জন্মের সৌভাগ্য। কিন্তু খাওয়াব কি তোমাকে?

—ভয় নেই ক্ষুদিরাম, তুমি যা দেবে তাই আমি তৃপ্তির সঙ্গে নেব। আমার অভিলাষ পূর্ণ করতে আপত্তি কোর না।

স্বপ্ন ভেঙে গেল। জ্যোতির্ময় পুরুষ অন্তর্হিত হলেন।

গয়ার কাজ সেরে ফিরে এলেন ক্ষুদিরাম। স্বপ্নের কথা কাউকে

তিনি বললেন না। শুধু মনে মনে ভাবলেন, দেখি স্বপ্ন সত্যি হয় কি না। বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন, চন্দ্রমণির সারা অঙ্গে রূপ যেন আর ধরে না। রূপ তো নয়, দিব্য জ্যোতি ঘিরে আছে তাঁর শরীর। স্বামীকে কথায় কথায় বললেন, তুমি যখন গয়াতে তখন এখানে আমি নানারকম অলৌকিক দৃশ্য দেখেছিলাম। একদিন যুগীদের শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে ছিল ধনী কামারনি। তার সঙ্গে কথা বলছি। এমন সময় দেখলুম শিবের গা থেকে দিব্য-জ্যোতি বেরিয়ে মন্দির ভরে গেছে, আর সেই জ্যোতি যেন ঢেউয়ের মত আমার দিকে ছুটে আসছে। তারপর সেটা মিলিয়ে গেল আমার শরীরে। আমি মূর্ছা গেলাম।

—চন্দ্রা, গয়াতে গিয়ে আমিও ঐ রকম স্বপ্ন দেখেছিলাম। গদাধর জানিয়েছেন আমাদের আবার পুত্র লাভ হবে। এসব কথা এখন কাউকে বলো না।

দিন যায়। তারপর একদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন চন্দ্রমণি। চারদিকে শাঁখ বেজে উঠলো। কুলবধূরা দিলো হুলুধ্বনি। ক্ষুদিরাম পাঁজী খুলে দেখলেন। ঐ দিন বাংলা ১৭৫৭ সনের ৬ ফাল্গুন, ইংরেজী ১৮৩৬ সালের ১৮ ফেব্রুআরি, শুক্লপক্ষ, বুধবার। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। নবজাতকের রাশিচক্র গণনা করে দেখলেন, এই শিশু ক্ষণজন্মা। জ্যোতিষীরাও গুণে তাই বললেন। আজ থেকে একশো চল্লিশ বছর আগে কামারপুকুরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনিই যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

নবজাতকের নাম রাখা হলো গদাধর। শিশু গদাধর যেন সকলের নয়নের মণি। কামারপুকুরের সবারই মন কেড়ে নিয়েছে। প্রতিবেশিনীরা তাদের কাজকর্ম সেরে সময় পেলেই একবার আসেন ক্ষুদিরামের বাড়িতে; দেখে যান তাঁর এই নবজাতক পুত্রটিকে।

অপরূপ সৌন্দর্য শিশুর। সকলেই যেন প্রাণের টান অনুভব করে তাকে দেখে। কিন্তু পিতামাতার দুশ্চিন্তার অবধি নেই। কেমন করে তাঁরা শিশু পুত্রটিকে লালন-পালন করবেন—এই চিন্তা। ঘরে দুধ নেই যে, দুধের বাছাকে একটু প্রাণভরে দুধ খাওয়াবেন।

ক্ষুদিরামের এক ভাগ্নে—নাম রামচাঁদ—থাকতো মেদিনীপুরে। তিনি যখন খবর পেলেন, মামীর একটি ছেলে হয়েছে তখনি তিনি পাঠিয়ে দিলেন একটি দুগ্ধবতী গাভী। শুধু তাই নয়। রামচাঁদ তখন থেকে মাসে মাসে পনর টাকা করে পাঠাতে লাগলেন তাঁর মামাকে। দুশ্চিন্তা কিছুটা দূর হলো। ক্ষুদিরামের অমনি মনে পড়ে যায় গয়াতে স্বপ্নে দেখা সেই জ্যোতির্ময় দিব্য পুরুষের কথা—'ভয় নেই ক্ষুদিরাম, সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে!

দেখতে দেখতে গদাধর পাঁচ মাসের হলো। এখন ছেলের মুখে ভাত দিতে হবে। ক্ষুদিরাম ভেবেছিলেন রঘুবীরের প্রসাদী অন্ন ছেলের মুখে দিয়ে সামান্য ভাবে অন্নপ্রাশনের কাজটা সারবেন। ঘটা করে করবার সঙ্গতিই বা কোথায় তাঁর? এমন সময় একদিন লাহাবাবু এলেন ক্ষুদিরামের কাছে। ধর্মদাস লাহা, গ্রামের জমিদার, ক্ষুদিরামের তিনি পরমবন্ধু। লাহাবাবু জিজ্ঞাসা করেন, ঠাকুরমশাই, ছেলের অন্নপ্রাশনের কথাটা কিছু ভেবেছেন? ক্ষুদিরাম বললেন, ভেবে আর কি করব? দুটো প্রসাদী অন্ন ছেলের মুখে দিয়ে নিয়মটা রক্ষা করব। তখন লাহাবাবু বললেন, কেন, আমি রয়েছি কি জন্য? আবার চকিতে ব্রাহ্মণের মনে পড়ে যায় সেই আশ্বাস বাণী—তোমার কোনো ভয় নেই, সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

পুত্রের জন্মের সময় থেকেই তিনি সবিস্ময়ে দেখছেন, সত্যিই যখন যেটার দরকার, অমনি বন্দোবস্ত হয়ে যাচ্ছে। আজ অন্নপ্রাশনের বন্দোবস্তটাও হয়ে গেল। লাহাবাবুই সব খরচ দিলেন। গ্রামের যত ব্রাহ্মণ সজ্জন আর ব্রাহ্মণেতর সকলেই ক্ষুদিরামের ছেলের অন্নপ্রাশনে পরিতৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ পেলেন। গরীব দুঃখীরাও বাদ গেল না।

দেখতে দেখতে গদাধরের বয়স পাঁচ বছর হলো। ছেলেকে এবার পাঠশালায় পাঠাতে হবে। লাহাবাবুদের নাটমণ্ডপেই পাঠশালা বসতো। যথা সময়ে ক্ষুদিরাম ছেলের হাতে খড়ি দিয়ে তাকে পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন। মাথায় লম্বা চুল, ফুটফুটে রং, পাতলা গড়ন। গদাধর যখন পাততাড়ি বগলে নিয়ে পাঠশালায় যেত, তখন বালকের মুখের অমিয়মাখা হাসি সকলের মন কেড়ে নিত। যে একটিবার দেখত সেই-ই মুগ্ধ হতো। গদাই পাঠশালায় যায়। চন্দ্রাদেবী তার কাপড়ের খুঁটে মুড়ি বেঁধে দেন। সেই মুড়ি সে তার সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খেতো। অল্পদিনের মধ্যেই গুরু মশাই বুঝলেন, গদাধর সাধারণ পড়ুয়ার মতো নয়। সে যেমন শ্রুতিধর তেমনি স্মৃতিধর; যা একটিবার শোনে, তাই তার মনের মধ্যে গেঁথে যায়।

গাঁয়ে মাঝে মাঝে যাত্রা হতো। গদাই যাত্রা শুনতে খুব ভালো বাসত। এইভাবে ছেলেবেলা থেকেই যাত্রা শুনে শুনে রামায়ণ ও ভাগবতের সব কাহিনী তার কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। শুধু মুখস্থ বলা নয়, একেবারে নিখুঁত অভিনয় করতে পারতেন। এইভাবে যাত্রাভিনয়ে সে এমন দক্ষতা অর্জন করলো যে তা বলবার নয়। পাড়ার বর্ষিয়সী মহিলারা যখন বলতেন, গদাই, এবার যাত্রা হোক, অমনি তিনি সঙ্গীদের নিয়ে যাত্রা জুড়ে দিতেন।

অল্পদিনের মধ্যেই গদাধর লিখতে পড়তে বেশ রপ্ত হলো। হাতের লেখা ছিল সুন্দর—একেবারে যেন মুক্তোর পাঁতি। ঐ বয়সেই সে আর একটি বিদ্যা আয়ত্ত করেছিল। গাঁয়ের কুমোরদের দেবদেবীর মূর্তি গঠন করতে দেখে গদাধরের ইচ্ছে হলো সেও মূর্তি গড়বে। কুমোরদের বাড়ি গিয়ে, তাদের জিজ্ঞাসা করে করে, সে মূর্তি গড়তে শিখলো। সেই সঙ্গে ছবি আঁকাও। এই দুটি জিনিস—ছবি আঁকা আর পুতুল গড়া বালক এমন সুন্দর শিখেছিল যে বলা যায় না।

বাড়িতে তার জীবন্ত আদর্শ ছিলেন ক্ষুদিরাম আর চন্দ্রমণি। পিতা

মাতার ধর্মভাব দেখেই বাল্যকালে গদাধর তার চরিত্র গঠন করেছিল। বাবা করতেন রঘুবীরের পূজা অর্চনা, মা করতেন বিগ্রহের সেবা পূজার আয়োজন। এটা রোজ দেখত গদাধর। বাবাকে পূজো করতে দেখে বালকের মনেও ইচ্ছা জাগলো সেও ঠিক ঐ ভাবে পূজো করবে। কিন্তু পৈতে না হলে পূজোয় অধিকার জন্মায় না। কিন্তু বালক নিরস্ত হয় না। পূজোর ফুল তুলতে তো বাধা নেই। রোজ পূজোর জন্য সে সাজিভরে ফুল তুলতো আর যতক্ষণ না পূজো শেষ হতো, কাছে বসে থাকতো।

একদিন একটা বড় মজার ব্যাপার হলো। ক্ষুদিরাম তন্ময় হয়ে রঘুবীরের পূজো করছেন। ধ্যান করছেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে। ঘরে আর কেউ নেই। এমন সময় পূজোর ঘরে প্রবেশ করে গদাই। বাবাকে ঐ অবস্থায় দেখে সামনে সাজানো নৈবেদ্যের থালা থেকে ফল মূল একটা করে তুলে খেয়ে শেষ করলো নিঃশব্দে। তারপর ফুলের থালা থেকে মালা ছড়াটা তুলে নিয়ে নিজের গলায় পরলো। রঘুবীরের মূর্তিটা হাতে তুলে নিয়ে নিজে বসলো সেই আসনে। ক্ষুদিরামের তবু ধ্যান ভাঙে না।

—ওগো ছ্যাখো না, মালা পরে কেমন সেজেছি।

ক্ষুদিরামের ধ্যান ভেঙে যায়। চোখ মেলে তিনি যা দেখলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। চকিতে মনে পড়ে গয়ার বিষ্ণু মন্দিরে সেই বিচিত্র স্বপ্নের কথা। ছেলেকে কিছু বললেন না তিনি। শুধু মনে মনে ভাবলেন এইতো সাক্ষাৎ গদাধর।

গদাধরের বয়স যখন সাত বছর ছ'মাস তখন ক্ষুদিরাম মারা গেলেন। কামারপুকুরের এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে এইবারে ঘনিয়ে আসে একটা দারুণ পরিবর্তন। রামকুমার বাড়ির বড় ছেলে। তাঁকেই এখন সংসারের হাল ধরতে হলো। তাঁর শোক করবার অবসর নেই। তিনটি নাবালক ভাই বোন আর শোকসন্তপ্তা বিধবা মা। এদের মুখ

চেয়ে রামকুমারকে ভুলতে হয় পিতৃবিয়োগ ব্যথা। দরিদ্রের সংসার আর চলে না। রোজগারের নতুন পথ দেখার জন্য কলকাতায় যাবেন ঠিক করলেন রামকুমার। যাওয়ার আগে ছোট ভাই গদাধরের পৈতে দিয়ে গেলেন।

আরো পাঁচটা বছর কেটে গেল। রামকুমার তখন রামেশ্বরের বিয়ে দিলেন, ছোট বোনেরও বিয়ে দিলেন। এই সময়ে রামকুমারের ভাগ্যে নেমে এলো নিয়তির নির্মম আঘাত। তাঁর স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে আঁতুর ঘরেই মারা যান। আবার শোকের ছায়া নামে ক্ষুদিরামের সংসারে। কিন্তু মানুষের শোক করবার অবসর কোথায়? তাই আগের মতোই সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে হয় রামকুমারকে। দিন দিন বিদায় আদায় কমে যেতে লাগলো। দেখা দেয় অর্থের অভাব। জমিতে আগের মতোই ধান হয় প্রচুর, কিন্তু শুধু ধান দিয়ে তো আর সংসার চলে না। কাপড় চাই, নিত্যকার দরকারী অনেক জিনিসই চাই। সে সব আসে কোথা থেকে!

রোজগারের উপায় চিন্তা করেন রামকুমার। কোলকাতায় গেলে নাকি রোজগার হতে পারে। এই পরামর্শ দিলেন তাঁকে অনেকে। তারপর একদিন রামেশ্বরের ওপর সংসারের ভার দিয়ে তিনি এলেন শহরে। ঝামাপুকুরের রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ির কাছেই একটা টোল খুলে বসলেন। ছাত্রের অভাব হলো না। সেই সঙ্গে কয়েকটা বাড়িতে যজমানিও মিলে গেল। দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে দেব সেবার ভার পেয়েছিলেন রামকুমার। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অল্পদিনেই ছড়িয়ে পড়ল।

কিছুদিন বাদে ছোট ভাইটিকেও তিনি কামারপুকুর থেকে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন। গদাধরের বয়স তখন ষোল বছর। টোলে ছাত্র পড়ানো, এতগুলো বাড়িতে নিত্য দেবসেবা করা একা রামকুমার যেন আর পেরে উঠছিলেন না। ছোট ভাইকে তিনি কলকাতায় এনে লাগিয়ে দেন দেবসেবায়। সেই সঙ্গে তাকে কিছু সংস্কৃত শেখাবার

ইচ্ছাও তাঁর হয়। কিন্তু গদাধর বলেন, দাদা, তোমার ঐ চালকলা বাঁধা বিদ্যেয় আমার কাজ নেই।

—কাজ নেই তো বুঝলাম, কিন্তু তুই এখন বড় হয়েছিস, একটা কিছু কাজ তো করতে হবে, নইলে সংসার চলবে কি করে?

—রঘুবীরের সংসার কি অচল থাকে, দাদা?

তখন রামকুমার ভাইকে কয়েকটি বাড়িতে দেবপূজার কাজে লাগিয়ে দিলেন। এটাই ছিল গদাধরের যেন মনের মতো কাজ। যে সব বাড়িতে পূজো করেন যে সব স্থানে অল্পদিনের মধ্যেই এই প্রিয়-দর্শন কিশোর পূজারী ব্রাহ্মণ খুব প্রিয় হয়ে উঠলেন। তাঁর সরল ব্যবহার, মিষ্টি কথা আর ঈশ্বরে ভক্তি দেখে সম্ভ্রান্ত ঘরের পুরমহিলারা নিঃসংকোচে তাঁকে অন্তঃপুরে ডেকে পাঠাতেন। তাঁর মধুর কণ্ঠের গান শুনে তাঁদের আনন্দের সীমা থাকত না।

আরো দুটো বছর কেটে যায়। অগ্রজের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও গদাধর কিছুতেই চালকলা বাঁধা বিদ্যে শিখলেন না। দাদা যত বলেন, ভাই তত বলেন, আমি চাই আসল জ্ঞান।

রামকুমার বুঝলেন অর্থকরী বিদ্যা শিখতে কনিষ্ঠের আগ্রহ নেই এতটুকু। এদিকে আর্থিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়, দেনা বেড়ে চলে। টোল বন্ধ করে, অন্য কোনো কাজ করবেন কিনা তা চিন্তা করেন রামকুমার। আর কি কাজই বা তিনি জানেন যে করবেন। যজন-যাজন আর অধ্যাপনা—এর বাইরে আর তো কিছু জানা নেই তাঁর। এই ভাবে যখন তিনি দিনযাপন করছিলেন তখন একদিন রাণী রাসমণির মন্দিরে পূজকের কাজ করার জন্য অনুরোধ এলো তাঁর কাছে। রঘুবীর তাহলে মুখ তুলে চাইলেন, ভাবেন রামকুমার। গদাই মিথ্যে বলে নি, রঘুবীরের সংসার কখনো অচল থাকে না। বাবা তো এই বিশ্বাস নিয়েই সংসার ধর্ম করে গেছেন। গৃহ দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানালেন রামকুমার। প্রণাম জানালেন তাঁর পুণ্যবান পিতার স্মৃতির উদ্দেশে।

যেদিন দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়, সেদিন রামকুমার সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন কনিষ্ঠ গদাধরকে। এই গদাধরই উত্তরকালে দক্ষিণেশ্বরেশ্বর বলে পূজিত হয়েছিলেন সারা বাংলা দেশে, সারা ভারতে, এমন কি সারা পৃথিবীতে। তাঁরই তপস্যায় গঙ্গার তীরে এই অখ্যাত অজ্ঞাত স্থানটি কেমন করে নবযুগের একটি তীর্থে পরিণত হলো, এইবার আমরা সেই কাহিনী বলছি।

খুব ধূমধাম করেই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। রাণী অকাতরে টাকা খরচ করেছিলেন। কত দিগ্‌দেশ থেকে কত যে অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এসেছিলেন তার সীমা সংখ্যা ছিল না। ভিখারীদের জন্য ভূরিভোজনের ব্যবস্থা ছিল। এই উৎসবে খরচ হয়েছিল সব শুদ্ধ ন' লক্ষ টাকা। যা ছিল এক সময়ে পীরের স্থান আর মুসলমানদের কবরখানা, সেইখানে এখন উঠলো বিশাল সুউচ্চ এক মন্দির। চাঁদনীর দু'পাশে, উত্তরে ও দক্ষিণে, ছয়টা করে বারোটা শিব মন্দির। তার পরেই মন্দির প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মাঝখানে ঠিক একই সারিতে দুটি মন্দির। উত্তরদিকে রাধাকান্তের, দক্ষিণে মা ভবতারিণীর মন্দির।

একটি রাধাকান্ত বিগ্রহ পশ্চিমদিকে মুখ করে বিরাজ করছেন। দক্ষিণে কালীমন্দির। পাষাণময়ী কালীপ্রতিমা। ইনিই দক্ষিণেশ্বরের ইষ্ট দেবী মা ভবতারিণী। সাদা আর কালো মার্বেল পাথর দিয়ে আগাগোড়া হর্ম্যতল আবৃত, উঁচু বেদী। বেদীর ওপর রূপোর একটা সহস্রদল পদ্ম, সেই পদ্মের ওপর দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে সাদা পাথরের তৈরি শিব শবরূপে শয়ন করে আছেন। তাঁর বুকের ওপর দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন দেবী ভবতারিনী। সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালীর এই প্রস্তরময়ী অপূর্ব মূর্তিটির সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে কত স্বর্ণ অলংকার। কালী মন্দিরের সম্মুখে নাট মন্দির। নাট মন্দিরের ওপর মহাদেব ও নন্দী-ভৃঙ্গী। চকমিলান উঠানের তিনদিকে একতলা ঘরের সারি। পূবদিকের ঘরগুলির মধ্যে আছে ভাঁড়ার ঘর, লুচি ঘর, বিষ্ণুর ভোগঘর, নৈবেদ্য ঘর, মায়ের ভোগঘর,

ঠাকুরদের রান্নাঘর ও অতিথিশালা। দক্ষিণদিকের ঘরগুলিতে দপ্তরখানা ও কর্মচারিদের থাকবার জায়গা। পশ্চিম কোণে একটা ঘর। এইটাই পরে রামকৃষ্ণদেবের বাসস্থান হয়েছিল। ঘরের ঠিক পশ্চিমে অর্ধেক গোলাকার একটা বারান্দা। এই বারান্দার পরেই পথ। তার পশ্চিমে ফুলের বাগান। ফুলের বাগান পার হলেই গঙ্গাতীরের রাস্তা। ঘরের উত্তরেও একটা রাস্তা আছে। রাস্তার উত্তরে বাগান; বাগানের উত্তরে নহবৎ। নহবতের উত্তরে বকুলতলার ঘাট। ঘাটের উত্তরে জঙ্গল, কবরডাঙা আর ঘন ঝাউগাছের বন।

এইবার আমরা দেখব গঙ্গার তীরে, এই মনোরম স্থানে, বহু সাধকের বহুসাধনার ধারা এক নিরক্ষর সাধকের ধ্যানের মধ্যে কেমন করে এসে মিললো। দেখব কেমন করে তাঁর অলৌকিক সাধনার জ্যোতি ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো শতাব্দীর পটে। আর কেমন করেই বা তিনি ধর্মজগতে নিয়ে এলেন এক অকল্পিত যুগান্তর।

তিন

গদাই, চাকরী করবি ?

কোথায় ? কি চাকরী, দাদা ?

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে। সেজবাবু বলছিলেন আমাকে। হৃদুকেও একটা চাকরী দেবেন বলেছেন।

মন্দির প্রতিষ্ঠার কয়েক সপ্তাহ পরের কথা। একদিন রামকুমার তাঁর ছোটভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন এই কথা। গদাধরের সৌম্য আকৃতি, কোমল স্বভাব। সহজেই ধর্মনিষ্ঠ রাসমণি ও তাঁর জামাই মথুরানাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইতিমধ্যে কামারপুকুর থেকে রামকুমারের ভাগ্নে হৃদয়ও এসেছে কলকাতায় চাকরির খোঁজে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে গদাধর গঙ্গামাটি দিয়ে শিবঠাকুরের মূর্তি গড়িয়ে পূজো করলেন। মথুরবাবুর নজরে গেল মূর্তিটি। তিনি জানতে পারলেন ছোট ভট্টাচার্য এটি তৈরি করেছেন। মূর্তিটি চেয়ে নিয়ে তিনি রাণীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেটি দেখে রাণী বললেন, ওঁকে মন্দিরের কাজে লাগাও।

মথুরানাথের অনুরোধ আর আগ্রহের পীড়াপীড়িতে গদাধর মন্দিরে

চকরি নিলেন। তিনি মায়ের বেশকারী নিযুক্ত হলেন। ভাগ্নে হৃদয়ও একটা চাকরি পেয়ে গেলেন। মামা-ভাগ্নে দুজনেই দক্ষিণেশ্বরে থাকতে লাগলেন। এই সময় একটা ঘটনায় রাসমণি ও মথুরাবাবুর শ্রদ্ধা বেড়ে যায় গদাধরের ওপর। সেই ঘটনাটি এই। ভাদ্র মাস। নন্দোৎসবের দিন। রাধাকান্তের পূজো ও ভোগ-রান্নাদি হয়ে গেছে। পূজারী বিগ্রহ যুগলের শয়নের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ মূর্তিটিকে কোলে করে শয়নঘরে নিয়ে যাবার সময় পূজারী পা পিছলিয়ে পড়ে গেলেন। বিগ্রহের একটা পা ভেঙে গেল। শুনে রাসমণির খুব দুঃখ হলো। অকল্যাণ আশংকা করে তিনি পণ্ডিতদের কাছে বিধান চাইলেন। তাঁরা বললেন ভাঙা মূর্তিকে জলে ফেলে দেওয়া হোক। আর একটা নতুন মূর্তি গড়িয়ে পূজো করতে হবে।

রাণীর কিন্তু এই বিধান মনঃপূত হয় না। জামাইকে বললেন, তুমি একবার ছোট ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করো। সব শুনে গদাধর বললেন : রাণীর জামাইদের মধ্যে কেউ যদি পড়ে পা ভেঙে ফেলতো তবে কি তাকে ত্যাগ করে আর একজনকে তার জায়গায় এনে বসানো হতো, না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হতো ? এখানেও তাই করা হোক —মূর্তির পা জুড়ে দেওয়া হোক।

ব্যবস্থা শুনে সবাই অবাক। তখন রাণীর অনুরোধে বিগ্রহের ভাঙা পা নিজের হাতে এমনভাবে জুড়ে দিলেন যে বিগ্রহের পা যে কখনো ভেঙেছিল তা বুঝতে পারা গেল না। তখন থেকে মথুরানাথ গদাধরকে রাধাকান্তের পূজারী নিযুক্ত করেন। কিছুকাল বাদে রামকুমার অবসর নিলেন। তখন গদাধর ভবতারিণীর পূজক নিযুক্ত হলেন আর বিষ্ণুঘরের পূজারীর পদে রইলেন হৃদয়। শুরু হয় গদাধরের জীবনে এক নতুন অধ্যায়। যদিও দেবীপূজার নিয়ম পদ্ধতি তিনি তাঁর দাদার কাছ থেকে শিখে নিয়ে ছিলেন, তবু তাঁর মনে হলো যে, মায়ের পূজা করতে হয় তন্ত্রমতে। কিন্তু দীক্ষা না হলে তন্ত্রমতে দেবীপূজার অধিকার হয় না। কলকাতায় থাকতেন একজন প্রবীণ শক্তিসাধক

নাম তাঁর কেনারাম ভট্টাচার্য। দাদার চেনা তান্ত্রিক। তাঁর কাছেই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন গদাধর। দীক্ষার পর তিনি ভবতারিনীর পূজা-অর্চনা যথারীতি করতে থাকেন।

এই ঘটনার কিছুদিন বাদে রামকুমার মারা গেলেন। অগ্রজ ছিলেন তাঁর পিতৃতুল্য। তাই তাঁর মৃত্যুতে গদাধর যারপর নাই ব্যথিত হয়েছিলেন। মায়ের পূজায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিলেন গদাধর। পূজো করতে করতে তাঁর মন ডুবে যেতো ভবতারিণীর ধ্যান ও চিন্তায়। তাঁর পূজো সাধারণ পূজারীর পূজোর মতো ছিল না। যে দেখতো সে-ই মুগ্ধ হতো। পূজার পর দেবীমূর্তির সামনে বসে তিনি রামপ্রসাদ ও কমলা কান্তের গান গাইতে গাইতে আত্মহারা হয়ে যেতেন। চোখের জলে বুক ভেসে যেতো।

যেমন পূজায় তন্ময়তা, তেমনি সুমধুর কণ্ঠে গান। কিন্নর কণ্ঠের সে গান যে একবার শুনতো, সে আর ভুলতে পারত না। তাঁকে সবাই ডাকে ছোটি ভট্চাজ বলে। তাঁর গান রাণীর খুব প্রিয় ছিল। তিনি যখনি দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন, গদাধরকে ডাকিয়ে তাঁর গান শুনতেন। 'কোন্ হিসাবে হর হৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে'—এই গানটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। তাঁর গানে কালোয়াতি ঢং থাকত না, ওস্তাদি কায়দা থাকত না, থাকত শুধু গানের ভেতরকার বিশুদ্ধ ভাবটির প্রকাশ—মর্মস্পর্শী মধুর স্বরে দিব্য প্রকাশ। তখন দক্ষিণেশ্বরের আকাশ-বাতাস প্রতি সন্ধ্যা ও সকালে এই তরুণ পূজারীর সুমিষ্ট কণ্ঠের অমৃতবর্ষী গানে ভরে থাকত।

শুধু পূজো নিয়েই থাকতেন গদাধর।

বাজে কথা একটিও বলতেন না।

তিলমাত্র সময় অপব্যয় করতেন না।

প্রভাতে ও সন্ধ্যায় পূজা অর্চনা যেই শেষ হয়ে যেত, অমনি আর তাঁর দেখা নেই। তিনি একেবারে নিখোঁজ, বেপাত্তা। কোথায় যেতেন? নহবতের উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে পঞ্চবটী। সেইখানে

আমলকী গাছের তলায় আসন করে তিনি ধ্যান করতেন নিবিষ্টচিত্তে। দিনের বেলায় সবাই যখন কাজকর্মে ব্যস্ত, তখন সকলের অলক্ষ্যে পঞ্চবটীতে এসে বসতেন গদাধর। রাতেও তাই। সন্ধ্যারতির পর যখন রাতে মায়ের মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যেত, তখন তিনি লোকসঙ্গ ত্যাগ করে এই নির্জন পঞ্চবটীতে চলে আসতেন। সারাটি রাত তাঁর কেটে যেত জগন্মাতার ধ্যানে।

এদিকে হৃদয় ভেবেই পেত না তার মামা কোথায় অন্তর্হিত হন। মাঝে মাঝে শুধু দেখতে পেতেন, গদাধর নহবতের উত্তরদিকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছেন। তাঁর তখনকার চলার ভঙ্গীটা, হৃদয়ের মনে হতো যেন আচ্ছন্নের মতো। এরকম হলে তো চলবে না। মামার রাতে ঘুম নেই, এজন্য ভাগ্নের চিন্তার অন্ত নেই। ঠাকুর সেবার খাটুনি বড় কম নয়, তার ওপর মামার খাওয়া-দাওয়া ইদানীং একেবারে কমে গিয়েছে। এমন অবস্থায় রাতে না ঘুমুলে শরীর ভেঙে যেতে পারে। তখন হৃদয় ঠিক করলো, এবিষয়ের খোঁজ-খবর নিতে হবে, আর দরকার হলে যথাসাধ্য প্রতিবিধান করতে হবে। মামা অন্ত প্রাণ ছিল হৃদয়ের। মামা যায় কোথায়? হৃদয়রামের কৌতূহল বেড়ে ওঠে।

একদিন রাতে অলক্ষ্যে মামার পিছু নিলো সে। দেখলে মামা সোজা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলেন। হৃদয় দেখে তার মামা আমলকী গাছের তলায় এসে পরণের কাপড়খানি খুললেন, গলা থেকে পৈতেটাও খুললেন, তারপর উলঙ্গ হয়ে ধ্যানে বসলেন। হৃদয়ের বিস্ময়ের সীমা নেই। এ যে পাগলের কাণ্ড! বলি এসব কি কাণ্ড-কারখানা তোমার? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?—এইভাবে কত কথাই না সে বলতে থাকে তার মামার উদ্দেশে। কিন্তু শুনবে কে? গদাধর তখন জগন্মাতার ধ্যানে আত্মহারা।

কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য ফিরে এলে দেখেন সামনেই হৃদয় দাঁড়িয়ে। বলি এসব কি হচ্ছে তোমার?

—তুই এসব কিছুই বুঝবি না, হৃদু। এইভাবে পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়।

মামার কথার কোন জবাব দিতে পারে না হৃদয়।

দক্ষিণেশ্বরের এই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে বসে অলৌকিক সাধনা করেছিলেন এক-আধ বছর নয়, একেবারে বারো বছর। এমন সাধনা আর কেউ কখনো করেনি। তাঁর সেই সাধনার মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল একটি নবযুগ আর একটা নতুন ধর্মীয় চেতনা। ধ্যানের মাত্রা দিন দিন বাড়তে থাকে তরুণ পূজারীর। একদিন নির্জন মন্দিরের মধ্যে জগন্মাতার সামনে তিনি প্রার্থনা করছেন: 'মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় কেন তবে দেখা দিবি না? আমি ধন-জন, ভোগসুখ কিছুই চাইনে, আমায় দেখা দে।'

পূজা-অর্চনা শেষ হয়ে গেলে প্রতিদিন ভক্তের কণ্ঠে শোনা যেত এই আকুল প্রার্থনা। পূজা-শেষে প্রতিদিন তিনি দেবীকে সিদ্ধ ভক্তদের রচিত গান শোনাতেন। এই গান ছিল সেই অদ্ভুত পূজারীর পূজারই অঙ্গবিশেষ। গান তো নয়, যেন ভক্তহৃদয়ের গভীর ব্যাকুলতা মায়ের পায়ে এসে অঞ্জলি হয়ে ঝরে ঝরে পড়তো—এক দিব্যভাবে ভরে উঠতো তাঁর হৃদয়মন। বুক ভেসে যেত চোখের জলে। বিশ্বাস আর ভক্তি, আর্তি আর অনুরাগ ঢেলে দিয়ে বলতেন, আমায় একটিবার দেখা দে মা।

দিন দিন জগন্মাতার জন্য অধীর হয়ে ওঠেন গদাধর।

ঠিক সময়ে ঘুম নেই, খাওয়া নেই। তুই-ই কমে আসতে থাকে। মায়ের সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া চাই, নইলে কিসের ধ্যান, কিসের পূজো? এমনি করে দিন যায়। শেষে একদিন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন তিনি। ভাবলেন, মায়ের যখন দেখাই পেলাম না, তখন এ জীবন রেখে লাভ কি? মায়ের হাতের সুতীক্ষ্ণ খড়্গটির দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে। অমনি সেটা তুলে নিয়ে নিজের গলার কাছে ধরেন। ঠিক সেই মুহূর্তে জগজ্জননী জ্যোতির্ময়ী চেতন মূর্তি নিয়ে আবির্ভূতা হলেন ভক্ত-সন্তান গদাধরের

সামনে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জ্ঞান হারিয়ে মন্দিরের মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লেন—ঝড়ে যেমন করে লুটিয়ে পড়ে কলাগাছ।

পূজারী কি দেখলেন? দেখলেন, ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হয়ে গেছে সেই রূপের ছটায়। কোথাও যেন আর কিছুই নেই —শুধু কি এক অসীম অনন্ত চেতনা আর জ্যোতির সমুদ্র। চারদিক থেকে তার উজ্জ্বল তরঙ্গমালা তর্জনগর্জন করে তাঁকে গ্রাস করবার জন্য মহাবেগে এগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে সেই ঢেউগুলি এসে পড়ে তাঁর ওপর, ডুবিয়ে তলিয়ে দিলো যেন তাঁকে কোথায়। এর পর থেকেই গদাধরের মনে জাগলো এক তীব্র আকুলতা—রাতদিন সর্বক্ষন তিনি দেখবেন মায়ের ঐ চিন্ময়ী রূপ।

সে গদাধর আর নেই এখন।

সেই দিব্য দর্শন তাঁর শরীর ও মনকে ভেঙে নতুন করে গড়লো।

এক নতুন রাজ্যে প্রবেশ করলেন তিনি। সে রাজ্যের সঙ্গে এ-পৃথিবীর কোন মিল নেই। সেখানে চন্দ্র সূর্য নেই, গ্রহতারা নেই—আছে শুধু জগন্মাতার অনন্ত রূপ-লহরী আর সেই রূপের অপরূপ ছটা। সেই রূপের ছটার উদ্ভাসিত এই দেশ। এখন থেকে তাঁর কাছে এই রাজ্যই সত্য বলে মনে হলো। ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে আসে বাইরের পৃথিবী। বিভোর হয়ে থাকেন পূজারী মায়ের চিন্তায়, মায়ের ধ্যানে। বিধিমত পূজা-অর্চনা আর তাঁকে দিয়ে চলে না।

কে পূজা করবে? আসনে বসেন বটে, কিন্তু পূজোর নিয়ম বা ক্রম কিছুই আর গদাধরের মনে থাকে না। পূজো করবার আগেই হয়তো নৈবেদ্য নিবেদন করে দিলেন। পাষাণময়ী প্রতিমা এখন চৈতন্যময়ীরূপে সর্বদা তাঁর সামনে বিরাজ করছেন। দেখতেন—রূপের ছটায় সমস্ত ঘরটা আলোকিত করে প্রসন্ন আননে দাঁড়িয়ে আছেন মা ভবতারিণী। কখনো পূজারী তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, কখনো বা দেখতেন, নিবেদনের আগেই নৈবেদ্য খাবার জন্য সিংহাসন থেকে মা যেন নেমে এসেছেন।

সত্যি, সে গদাধর আর নেই।

চোখ দু'টি তাঁর এখন সব সময়ের জন্য টকটকে লাল। আর সে চোখ সবসময়ের জন্য জলে ভরা থাকতো। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। পূজো করতে বসে কখনো পাষাণ মূর্তির নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখেন, মা সত্যিই নিঃশ্বাস ফেলছেন কিনা। রাতে দীপের আলোয় মন্দিরে মায়ের দিব্য দেহের ছায়া পড়তে দেখেননি। কখনো বা শুনতেন, মা পাঁইকোর পরে বালিকার মতো উৎফুল্ল হয়ে ঝম্‌ঝম্ শব্দ করতে করতে মন্দিরের ওপরতলায় উঠছেন। কল্পনা নয়, অনুমান নয়—তিনি সত্যি দেখতে পেতেন মন্দিরের দোতলার বারান্দায় এলোচুলে দাঁড়িয়ে মা কখনো কলকাতা, কখনো গঙ্গা দেখছেন।

লোকের মনে ধারণা হলো ভবতারিণীর পূজারী পাগল হয়ে গেছেন। হৃদয়ের দুশ্চিন্তার অবধি নেই। যদি বাবুদের কানে একথা যায় তাহলে তো চাকরি খতম। কিন্তু কতদিন আর চেপে রাখা যায়? একখান কথা লোকের মুখে মুখে সাতখান হয়ে জানাজানি হয়ে গেল। রাণী রাসমণি ও মথুরাবাবুর কানে গেল এইসব কথা। পূজারী নাকি পাগল হয়ে গিয়েছেন—ফুল বেলপাতা নিজের পায়ে ঠেকিয়ে নিয়ে মায়ের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। পূজার আসন ছেড়ে সিংহাসনের ওপর উঠে সস্নেহে জগদম্বার চিবুক ধরে আদর করছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। কখনো ভোগের থালা থেকে একদলা ভাত-তরকারী নিয়ে, বিগ্রহের মুখের সামনে ধরে বলে, এই নে মা, খা—বেশ করে খা। কখনো বা নিজে খেয়ে সেই উচ্ছিষ্ট দিতেন মায়ের মুখে। রাতে ঠাকুর শয়ান দিতে গিয়ে মায়ের রূপোর খাটেই কিছুক্ষণ শুয়ে রইলেন গদাধর।

মন্দিরের কর্মচারীরা এসে সেজবাবুকে বলে, ছোট ভট্চাজ পাগল হয়ে গেছেন। মথুরাবাবুর বিশ্বাস হলো না। মনটা খারাপ হলো। জানবাজার থেকে নিজেই একদিন এলেন দক্ষিণেশ্বরে। এলেন কাউকে খবর না দিয়েই। ঠিক পূজোর সময় অলক্ষ্যে থেকে তিনি

পূজারীর কার্যকলাপ দেখতে থাকেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখলেন। দেখলেন, দিব্যভাবে বিভোর পূজারী—মায়ের ধ্যানে তিনি যেন ডুবে গেছেন। মন্দিরে কে আসছে, কে যাচ্ছে, সেদিকে তাঁর যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। ভাবে বিভোর পূজারীর সেই মূর্তি দেখে তিনি মোহিত হলেন। বড় ভট্চাযের পূজো তিনি দেখেছেন, শাস্ত্রীয় বিধিমতে সুন্দর পূজা করতেন তিনি, কিন্তু পূজায় এমন তন্ময়তা, এমন ভক্তি বিগলিত ভাব তিনি কখনো দেখেননি। একটা অপূর্ব আনন্দে ভরে উঠলো তার হৃদয়। অনুভব করলেন—মায়ের দিব্য প্রকাশে মন্দির যেন সত্যিই জম জম করছে। এতদিনে বুঝি সার্থক হলো দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা। মনে মনে গদাধরের প্রতি ভক্তি-প্রণাম নিবেদন করলেন তিনি। তারপর কাউকে কিছু না বলে ফিরে এলেন জানবাজারে।

রাণীকে বললেন সব কথা। আর মন্দিরের কর্মচারীদের কাছে এলো তাঁর হুকুমনামা—ভট্চাজ মশাই যেভাবেই পূজো করুন না কেন, তাঁকে যেন কেউ বাধা না দেয়, বা কিছু না বলে। জামাইয়ের মুখে সব কথা শুনে রাসমনির শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তাহলে মন্দির প্রতিষ্ঠা সার্থক হয়েছে, মনে মনে ভাবেন তিনি। তিনি নিজেই এলেন একদিন গদাধরের পূজো দেখতে। পূজা শেষ হয়ে গেলে, গদাধর রাণীর কথা মত একখানা রামপ্রসাদী গাইলেন। গান করতে করতে হঠাৎ থেমে গেলেন। বলে উঠলেন, এখানেও বিষয় চিন্তা। এই বলে আস্তে রাণীর গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন।

পূজারী তবে অন্তর্যামী! নইলে কেমন করে তিনি জানতে পারলেন তাঁর মনের চিন্তা। সেই থেকে ছোট ভট্চাজের ওপর রাণীর ভক্তি ও বিশ্বাস আরো বেড়ে গেল। বুঝলেন ইনি এখন দিব্য উন্মাদ —এ অবস্থায় মায়ের বিধিমত পূজার জন্য একজন শাস্ত্রজ্ঞ নতুন পূজারী দরকার। নিযুক্ত হলেন রামতারক চট্টোপাধ্যায়, গদাধরেরই খুড়তুতো ভাই। রামকৃষ্ণ এঁকেই হলধারী বলে ডাকতেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর

সাধকজীবনের গোড়ায় হৃদয় আর হলধারী—এই দুজনেই ছিলেন তাঁর সেবক।

দেখতে দেখতে চার বছর কেটে গেল।

এই সময়ের মধ্যে গদাধর নিজের হাতে স্থাপন করেছেন একটা নতুন পঞ্চবটী। সেইখানে পেতেছেন তাঁর তপস্যার আসন। অশ্বত্থ, বট, অশোক, বেল আর আমলকী—এই পাঁচটি পবিত্র গাছ নিয়ে তৈরী হয় পঞ্চবটী। এর তলায় ধ্যান সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান—তন্ত্রে আছে এই কথা। কালীবাড়ির জনসাধারণ এখন গদাধরকে পাগল বলে জানে। কিন্তু রাণী, মথুরবাবু ও অন্যান্য দু'চারজন অন্তরঙ্গ লোকে জানতো, তিনি উন্মাদ নন—ঈশ্বর দর্শনের জন্য তাঁর অন্তরে এখন জেগেছে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই ব্যাকুলতার ফলেই তিনি উন্মাদের মতো আচরণ করতেন। কথা বলতেন উন্মাদের মতো। ঈশ্বরের জন্য যারা ব্যাকুল হয়, তাদের জীবনে এটা হয়, শাস্ত্রে আছে।

একদিন একজন এসে বলে, আপনার বায়ুরোগ হয়েছে। সরলপ্রাণ গদাধর তাই বিশ্বাস করলেন। মথুরাবাবুকে বললেন সেই কথা। —সেনবাবু, আমি গরীব বামুন, বাড়িতে আমার বুড়ো মা বর্তমান। একি ভাব হলো আমার? মথুরবাবু আশ্বাস দিয়ে বলেন, আজই আমি কলকাতায় গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজকে খবর দিচ্ছি। তিনি এসে তোমাকে দেখে যাবে। এলেন কবিরাজ। তখনকার দিনে কলকাতার নামকরা কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। তিনি রোগীর রোগের লক্ষণ দেখে, মধ্যমনারায়ণ তেল আর চতুর্মুখ বটিকা সেবনের ব্যবস্থা দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু তাতে রোগ নিরাময় হয় না।

হলধারী ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। একদিন কথায় কথায় তিনি তাঁর ভাইকে বললেন, তোমার কালী তো তামসী। এ দেবীর আরাধনা কর কেন? ঐ কথা শুনে গদাধরের মনটা বিষন্ন হয়, কিন্তু মুখে তিনি কিছু বললেন না। এলেন মন্দিরে। সজলনয়নে সরলমনে জগন্মাতাকে

জিজ্ঞাসা করেন, মা, হলধারী তোকে তমোগুণময়ী বলে। এ কি সত্যি?

—না। আমি সর্বগুণময়ী। ত্রিগুণময়ী আমি।

সহসা মন্দিরের ভেতরের চার দেয়াল কাঁপিয়ে কে যেন বললে এই কথা। রোমাঞ্চ দিল গদাধরের সর্বশরীরে। উল্লাসে উৎসাহিত হয়ে তিনি সোজা ছুটে এলেন হলধারীর কাছে। একেবারে চেপে বসলেন তাঁর কাঁধে। —তুই না শাস্ত্র পড়িস? তুই মাকে তামসী বলিস?

এখনো বলছি।

—মিথ্যে কথা। মা যে সব। ত্রিগুমণয়ী।

গদাধরের কণ্ঠস্বরে যেন প্রত্যয়ের সুর। হলধারীর মুখে আর কোন কথা নেই। উন্মাদের কথায় ও স্পর্শে শাস্ত্রাভিমানী পণ্ডিতের অন্তরের চোখ যেন ফুটে উঠলো। অন্তর দিয়ে স্বীকার করলেন ভায়ের কথা। শুধু স্বীকার করা নয়, ফুল-চন্দন নিয়ে অঞ্জলি দিলেন তাঁর পায়ে। গদাধরের মধ্যে তিনি যেন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রকাশ দেখতে পেলেন। কাছে দাঁড়িয়ে ছিল হৃদয়। সে বললে, মামা, এইবার বুঝলে তো ভাইটি তোমার কি ধরনের পাগল?

চার

গদাই পাগল হয়ে গিয়েছে—শেষ পর্যন্ত কথাটা কামারপুকুরে চন্দ্রাদেবীর কানে এসে পৌছল। একজন এসে বললে, এই তো দেখে এলাম কাদা-ধুলো মেখে তোমার ছেলে উলঙ্গ হয়ে মাটিতে মুখ ঘষছে আর আপন মনে বলছে, মা, আমায় দেখা দে, পাঁচজনের মুখে এইসব কথা শোনেন আর চন্দ্রাদেবীর মায়ের মন ছেলের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পরিচিত একজনকে বললেন, হ্যাঁগা বাছা, একবার গিয়ে আমার গদাইকে এখানে নিয়ে আসতে পারো?

তাই হলো। কামারপুকুর থেকে একদিন সত্যিই লোক এলো দক্ষিণেশ্বরে গদাধরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সঙ্গে এলেন তার মেজদা রামেশ্বর। মথুরানাথ শুনলেন সব কথা। ভাবলেন, হয়ত বাড়িতে মায়ের কাছে কিছুদিন থাকলে সুফল ফলতে পারে। ছুটী মঞ্জুর হলো। অনেকদিন বাদে গদাধর ফিরলেন তাঁর জন্মস্থান কামারপুকুরে। চার বছর পরে মায়ে-ছেলেতে সাক্ষাৎ। না, সব মিথ্যে কথা, তাঁর গদাই তো পাগল হয়নি। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে চন্দ্রমণি তাকিয়ে দেখলেন পুত্রের অন্তস্থল পর্যন্ত। গায়ে মাতৃস্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে

অনুভব করেন তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রের দিব্যোন্মাদ অবস্থা। মুখে কিছু বললেন না, বা কাউকে কিছু জানতেও দিলেন না। কিন্তু জিনিসটা চাপা থাকল না।

কামারপুকুরে ফিরে কিছুদিন ভালভাবেই কাটল। তারপর ভেতরের আকুলতা তো আর বেশিদিন চাপা থাকে না—ঠেলে বেরিয়ে আসে গদাধরের কণ্ঠ-নিঃসৃত 'মা' 'মা' রবের সঙ্গে। সে কি ব্যাকুলভাবে কান্না। কাঁদতে কাঁদতে হয়ে যান বাহ্যজ্ঞানশূন্য। পরিজনরা সকলে হন আতঙ্কিত। উৎকণ্ঠিত বোধ করেন চন্দ্রাদেবী। প্রতিবেশিরা পরামর্শ দেয়, ছেলের যদি কল্যাণ চাও তবে একটা ওঝা আনো।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজের মুখেই বলেছেন: 'একদিন একজন ওঝা একটা মন্ত্রপূত পলতে পুড়িয়ে শুঁকিয়ে দিলে। বললে, যদি ভূত হয়ত পালিয়ে যাবে, কিন্তু কিছুই হলো না। পরে কয়েকজন প্রধান ওঝা পূজাদি করে একদিন রাত্রিকালে চণ্ড নামালো। চণ্ড পূজা ও বলি গ্রহণ করে প্রসন্ন হয়ে তাদেরকে বললে, একে ভূতে পায়নি বা এর কোন অসুখ করেনি।'

সবাই তখন বিশ্বাস করলো যে গদাই পাগল হয়নি, তবে সংসারে তার টান নেই, সে ভগবানকে পেতে চায়। তখন আত্মীয়স্বজন সকলে পরামর্শ দিলেন, ছেলের বিয়ে দাও, তা'হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখবে বৌ'এর ওপর টান পড়লে ছেলের মন আর উড়ু উড়ু করবে না। সংসারধর্মে সে মন ঢেলে দেবে তখন। চন্দ্রাদেবীর মনে লাগে এই কথাগুলি। রামেশ্বরকে বলেন, গদাইয়ের জন্যে একটা মেয়ে খুঁজে বের কর দেখি। বেশ সুলক্ষণা মেয়ে দেখবি।

বিয়ের কথাটা প্রথম প্রথম গদাধরকে বলা হয়নি। ভাইয়ের জন্যে মেয়ে খুঁজতে থাকেন রামেশ্বর। আশে পাশের কয়েকখানা গ্রামেও লোক পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ছোট ছেলের বিয়ে—কথাটা লোকের মুখে মুখে জানাজানি হতে দেরী হয় না। গদাধরও জেনে ফেললেন কিছুদিন বাদে। এই সময়ে হৃদয়রামও

দিনকতকের ছুটী নিয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে এসেছে মামাকে দেখতে। প্রথম সাক্ষাতেই গদাধর তাকে বললেন, ওরে হৃদু, শুনেছিস, এরা আমার বে দেবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে।

—ভালোই তো, মামা।

—কিন্তু মেয়ে খুঁজে পাচ্ছে না। পাবে কি করে? ঐ জয়রামবাটী গাঁয়ে রামচন্দ্র মুখুয্যের মেয়েটি যে কুটো-বেঁধে রাখা আছে, দেখ গে যা।

হৃদয় তো তার মামার এই কথা শুনে অবাক। অন্য কেউ একথা বললে সে বিশ্বাসই করত না। বিয়ে করতে অনিচ্ছা নেই। শুধু তাই নয়—ভাবী কনেটির সন্ধান পর্যন্ত বলে দিলেন। আশ্চর্য মানুষ তার এই ছোট মামা। হৃদয়রাম আর ভাবতে পারে না। গদাধরের কথাই সত্য। লোক পাঠিয়ে খবর নিয়ে জানা গেল যে, কামারপুকুর থেকে দু'ক্রোশ দূরে জয়রামবাটীতে থাকেন এক সদাচারী ব্রাহ্মণ তাঁর নাম রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর একটা মেয়ে আছে বটে, কিন্তু তার তো বিয়ের বয়সই হয়নি। সবে পাঁচ বছর। শুনে রামেশ্বর মাকে বলেন, বয়সের যে অনেক তফাৎ, মা।

—হোক বয়সে ছোট, ঐ মেয়েই আমার গদাইয়ের বৌ। দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন চন্দ্রাদেবী।

তারপর বাংলা ১২৬৬ সনের বৈশাখের এক শুভলগ্নে রামচন্দ্র মুখুয্যের মেয়ে সারদার সঙ্গে—সারদামণির সঙ্গে—গদাধরের বিয়ে হলো। কনের বয়স পাঁচ বছর, বরের বয়স চব্বিশ। তিনশো টাকা পণ লাগলো এই বিয়েতে। বিয়ের রাতে বাসরঘরে বরসাজে সজ্জিত গদাধর মায়ের নাম গেয়ে কাটালেন।

বিয়ের দেড় বছর পরে গদাধর ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। আবার তিনি ব্রতী হলেন জগদম্বার সেবায়। কিছুদিন যেতে না যেতেই জগন্মাতার অর্চনায় আগের মতোই তন্ময় হয়ে গেলেন। মা, দাদা, স্ত্রী, সংসার—সকলের কথাই ভুলে গেলেন। কামারপুকুর মুছে গেল তাঁর

মন থেকে। সেই মনের মধ্যে এখন সর্বক্ষণের জন্য বিরাজ করতে লাগলেন জগৎ-জননী। আবার নতুন করে শুরু হয় সাধকের সাধনা।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরবার কিছুদিন পরে পুণ্যবতী রাণী রাসমণি দেহত্যাগ করেন। তখন থেকে মথুরানাথই রাণীর জমিদারীর সর্বময় কর্তা হলেন। ছোট ভট্চাজের ওপর তাঁর ভক্তি ও বিশ্বাস আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি। নানাভাবে তিনি মায়ের এই পূজারীকে যাচাই করে নিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ইনি একজন যুগাবতার। সেই যুগাবতারের সেবায় মথুরবাবু যেন নিজেকে বিলিয়ে দিলেন—যেমন করে শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন হনুমান। মথুরানাথের সেবায় ও ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে রামকৃষ্ণ বলতেন, মথুর আমার রসদদার।

এইবার শুরু হয় সাধনার দ্বিতীয় পর্ব।

একদিন ভোরবেলায় পঞ্চবটী-সংলগ্ন বাগানে গদাধর ফুল তুলছেন। এমনিভাবে পূজার ফুল তিনি রোজই তোলেন। সেই ফুল দিয়ে নিজের হাতে মালা তৈর করে ভবতারিণীকে প্রাণভরে সাজাতেন তিনি। গঙ্গার ধারে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের এই ফুলের বাগানটি দেখলে চোখ যেন জুড়িয়ে যেত। কত রকমের ফুলের গাছ সেই বাগানে আর কি বিচিত্র শোভা সেই বাগানটির। সর্বদাই ফুটন্ত ফুলের সৌরভে ভরপুর। গদাধর একমনে ফুল তুলছেন। এমন সময়ে একখানা নৌকা এসে লাগল সেই বাগানের ঘাটে।

নৌকা থেকে নামলেন এক ভৈরবী। পরিধানে গেরুয়া বস্ত্র, মাথায় চুল আলুলায়িত। একহাতে একটি ত্রিশূল। অপরূপ সুন্দরী। চোখেমুখে ফুটে বেরুচ্ছে একটা দিব্য জ্যোতি। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। পৌঢ় হলেও যৌবনের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য যেন এখনো ঘিরে রয়েছে তাঁকে। নৌকা থেকে নেমে সোজা চাঁদনীর দিকে চলতে থাকেন তিনি। ফুল তুলতে তুলতে গদাধর দেখলেন এই সন্ন্যাসিনীকে।

শুধু দেখা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হলো এ ভৈরবী যেন তাঁরই নিকট আত্মীয়া। ঠাকুরঘরে ফিরে এসেই ভাগ্নেকে ডেকে বলেন, হৃদু, চাঁদনীতে একজন ভৈরবী এসেছেন। তাঁকে ডেকে আনতে পারিস?

—বলো কি মামা? ডাকলেই তিনি আসবেন কেন?

—আমার নাম করে ডাকলেই আসবে।

—কি যে বলো মামা তার ঠিক নেই। কে কোথাকার ভৈরবী জানা নেই, শোনা নেই তাকে তুমি এখানে ডাকবেই বা কেন?

—সে তুই বুঝবিনে। আমি বলছি তুই আমার নাম করে তাকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়।

হৃদয় আর তর্ক করে না। মামার স্বভাব সে জানে। সে চলে যায় চাঁদনীর দিকে। অল্পক্ষণ পরেই তার পিছু পিছু ভৈরবী প্রবেশ করলেন মন্দিরে। তাঁকে দেখা মাত্র ভৈরবীর মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়ের রেখা। বিস্ময় আর আনন্দ। ভৈরবী বলেন, তুমি এখানে। আর আমি তোমাকে নানা জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। কণ্ঠস্বরে স্নেহ যেন উথলে পড়ছে। গদাধর জিজ্ঞাসা করেন, আমার কথা কেমন করে জানতে পারলে মা, ভৈরবী বলেন, একথা জগদম্বার কৃপায় অনেক আগেই জেনেছিলাম। আজ এখানে তোমার দেখা পেলাম।

দেখতে দেখতে গদাধরের মধ্যে জাগে বালকের ভাব। বালকের মতোই সরল মনে সব কথা তিনি খুলে বলেন তাঁর কাছে। একান্ত আগ্রহে বারবার জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁ গা, আমার এ সকল কি হয়—এই অলৌকিক দর্শন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত হওয়া, গা জ্বালা করা এসব কি গা? জগদম্বাকে মনে প্রাণে ডেকে সত্যিই কি আমার কঠিন ব্যাধি হলো? লোকে যে আমাকে পাগল বলে।

মনের কবাট খুলে দিলেন গদাধর।

ভৈরবী একমনে শুনলেন এই তরুণ সাধকের আত্মকাহিনী। শুনতে শুনতে তাঁর মনের মধ্যেও নানা ভাবের সঞ্চার হয়। স্নেহময়ী জননীর ন্যায় বাৎসল্যে আত্মহারা হলেন তিনি। শেষে নিবিড় স্নেহসিক্ত কণ্ঠে

বলেন, কে তোমাকে পাগল বলে, বাবা? পাগলের এ অবস্থা হয় না। একে বলে মহাভাব।

মহাভাব! মহাভাব কি?

ঈশ্বরের ভাব। ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য দেহ মনকে তুমি তোলপাড় করেছ, তা-ই এসব অবস্থা। যাঁরাই ভগবানকে একমনে ডেকেছেন, তাঁদের সবারই ঐ রকম অবস্থা হয়েছে এবং হয়। শ্রীরাধিকার মহাভাব হয়েছিল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরও মহাভাব হয়েছিল। ভক্তিশাস্ত্রে এসব কথা লেখা আছে। আমার কাছে সেসব পুঁথি আছে, আমি তোমাকে দেখাব।

কথায় কথায় বেলা হয়।—এবার উঠি বাবা। রঘুবীরের ভোগের সময় হলো, এই বলে ভৈরবী উঠলেন। তাঁর হাতে একটি ছোট পুটুলি তার মধ্যে রয়েছে কয়েকখানি পুরানো পুঁথি। গলায় বাঁধা একটি শালগ্রাম শিলা। গদাধর শুনলেন। সেইটিই রঘুবীর শিলা। তিনি হৃদয়কে বলে ঠাকুরবাটীর ভাণ্ডার থেকে ভৈরবীর সেবার জন্য সিধা আনিয়ে দিলেন। সিধা নিয়ে ভৈরবী গঙ্গার ধারে চলে গেলেন।

যথা সময়ে নিজের হাতে রান্না করে, ভৈরবী রঘুবীরের উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করতে বসলেন। সম্মুখে কালো রঙের ছোট্ট একটু গোল পাথরের মধ্যে অধিষ্ঠিত ইষ্টদেব রঘুবীর, তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত ভোগের উপচার। চোখ বুঁজে ধ্যানে বসলেন ভৈরবী। হারিয়ে যায় বাহ্যজ্ঞান। দুই চোখ বেয়ে ঝরে প্রেমাশ্রু ধারা। ঠিক এই সময়ে কোথা থেকে টলতে টলতে গদাধর সেইখানে এসে উপস্থিত। একেবারে নিবেদিত সেই ভোগের পাত্রের সামনে বসে পড়লেন। ভৈরবী কিছুই জানতে পারেন না। যখন তাঁর ধ্যান ভাঙ্গল, তখন সবিস্ময়ে তিনি চেয়ে দেখেন যে বাহ্যজ্ঞান রহিত গদাধর নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করছেন তাঁর রঘুবীরকে নিবেদিত অন্ন।

পাষাণ শিলা বুঝি এতদিনে জাগ্রত হলো। রোমাঞ্চিত কলেবরে ভৈরবী সেই দৃশ্য অপলক নয়নে দেখেন আর ভাবেন, এই

তো আমার রঘুবীর। ততক্ষণে ভাবাবিষ্ট গদাধর প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। হয়েছেন কিছুটা অপ্রস্তুত। নিজের আচরণ দেখে, লজ্জিত হয়ে বলেন, কে জানে বাপু, আত্মহারা হয়ে কেন এইরকম সব কাজ করে বসি।

বেশ করেছ বাবা। এ তো তুমি করনি, তোমার ভেতরে যিনি আছেন, তিনিই করিয়েছেন। ধ্যানে আমি যা দেখেছি, তাতেই বুঝেছি—কে এই রকমটা করেছে, আর কেনই বা করেছে। আর একথাও আজ বুঝতে পেরেছি বাবা, বাইরের পূজোও আমার শেষ হয়েছে, আর তার দরকার নেই। এতদিনে এইখানে এসে আমার সারাজীবনের পূজা-অর্চনা বুঝি সার্থক হলো। রঘুবীর শিলা এবার গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব।

মন্দিরের ঘাটের কাছেই এক নির্জন স্থানে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত করলেন যোগেশ্বরী ভৈরবী। এ তাঁর নিজের সাধনার জন্য নয়—গদাধরের জন্য। এরপর থেকেই ভৈরবীর উপদেশে শাস্ত্রবিহিত সাধনায় ব্রতী হলেন তিনি, আর তাঁকে সহায়তা করতে লাগলেন সাক্ষাৎ তন্ত্রমূর্তি ভৈরবী নিজে। এই কাজের জন্যেই তো তাঁর দক্ষিণেশ্বরে অগমন। একদিন তিনি গদাধরকে বললেন, আমি তোমাকে একে একে সমস্ত তন্ত্র শেখাব। আমি জগদম্বার আদেশ পেয়েছি।

তখন গদাধরের মনে আর কোন সংশয় রইল না।

গুরুরূপে তিনি বরণ করলেন মঙ্গলরূপিনী ভৈরবীকে। বরণ করলেন তাঁকে অমৃতময়ী মাতৃরূপে। এই তরুণ পূজারীর প্রতি অপত্য স্নেহ যেন উথলে পড়ে ভৈরবীর। সন্ন্যাসিনী দক্ষিণেশ্বরেই রয়ে গেলেন। এই সরল প্রকৃতি ও মাতৃনামে আত্মহারা সাধকের মুখের কথা শুনে ভৈরবীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হলো—ইনি কখনই সামান্য সাধক নন। ধারণা হলো—এ যে নিত্যানন্দের আধারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। ইনি অবতার। ইনি যুগদেবতা।

কথাটা দক্ষিণেশ্বরে লোকের মুখে মুখে রাষ্ট্র হয়ে যায়। একদিন

পঞ্চবটীতে বসে আছেন গদাধর। সামনে মথুর ও হৃদয়। ভগবানের প্রসঙ্গ হচ্ছিল—অন্য প্রসঙ্গের ত্রিসীমানা দিয়ে যেতেন না তিনি, কিংবা তাঁর মনই যেতে চাইত না। কথায় কথায় গদাধর মথুরকে বলেন, দ্যাখো, একজন বামুনের মেয়ে এখানে এসেছেন। তিনি আমাকে অবতার বলেন।

—তা কি করে হয়, বাবা? অবতার তো দশটি।

—কিন্তু ভৈরবী বলেন আমিও নাকি অবতার।

—তিনি কি করে বললেন এই কথা?

—তাঁর কাছে অনেক পুঁথি আছে আর তিনি সব শাস্ত্র জানেন। ভৈরবী বলেন, শাস্ত্রে যেসব লক্ষণের কথা বলা হয়েছে অবতারদের সম্পর্কে, সেই সব লক্ষণ নাকি তিনি আমার মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। এসব লক্ষণ একমাত্র অবতার ভিন্ন সামান্য মানুষে হতে পারে না।

এই রকম কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় ভৈরবী স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। বাঁ হাতে একখানি থালা। থালায় নানা রকমের মিষ্টান্ন। মথুর ও হৃদয়ের দৃষ্টি অমনি নিবদ্ধ হয় তাঁর প্রতি।—ইনিই কি সেই ব্রাহ্মণী, জিজ্ঞাসা করেন মথুর।—হ্যাঁ, ইনিই সেই। ইনিই আমাকে অবতার বলেন, সরল মনে বলেন গদাধর।

ভৈরবী আর নীরব থাকতে পারলেন না। বললেন—এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।

—একথা কোনো শাস্ত্রে আছে? মথুরের কঠিন জিজ্ঞাসা।

ব্রাহ্মণীর ভক্তি-শাস্ত্র সব কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি সেই সব গ্রন্থ থেকে শ্লোকের পর শ্লোক উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ দিলেন। মথুরানাথ শুনে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তবু তাঁর সংশয় দূর হয় না। ছোট ভট্‌চাজ যে একেবারে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার তা মানতে তাঁর বাধছিল। যাঁকে তিনি সামান্য মাইনেতে মন্দিরের পূজারীর কাজে নিযুক্ত করেছেন, তিনি একজন বড় ভক্ত কিংবা বড় সাধক হতে পারেন, অবতার কখনই নন। মনে মনে ভাবেন এইসব কথা তিনি।

অন্তর্যামী গদাধর মথুরের মনের ভাব টের পেলেন।

তাঁরো নিজের মনে সংশয় জেগেছে ভৈরবীর এই কথায়।

সেজবাবু, পণ্ডিতদের একটা সভা ডাকো, ব্রাহ্মণীর কথাটা একটু যাচাই করে নেওয়া হোক, তাহলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়।

মথুর বাবু এই প্রস্তাবে রাজী হলেন।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করে পত্রিকা পাঠালেন।

নির্দিষ্ট দিনে ডাকা হলো সেই সভা। স্মরণীয় সভা।

এলেন বিখ্যাত পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ আর নামকরা আরো অনেক পণ্ডিত। দক্ষিণেশ্বরে বসল এক বিচার সভা। সভার একটি পাশে বসে আছেন ভৈরবী, অন্য একটি পাশে নির্বিকার চিত্তে বসে আছেন গদাধর। বসে আছেন তিনি একেবারে চুপটি করে। বিচার আরম্ভ হলো। ভৈরবী প্রথমে ভক্তিশাস্ত্র থেকে অনর্গল ভাবে প্রমাণের পর প্রমাণ তুলে দেখাতে লাগলেন যে, গদাধরের মধ্যে যে দিব্যোন্মাদ অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাকে মহাভাব বলে। শ্রীরাধিকা আর মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন আর কারো শরীরে এই মহাভাব দেখা যায়নি।

পণ্ডিতরা তাঁর মত খণ্ডন করতে পারেন না।

বৈষ্ণবচরণ যেমন পণ্ডিত, তেমনি তত্ত্বদর্শী সাধক। ভৈরবীর কথা সমর্থন করে মুক্তকণ্ঠে তিনি সেই সভায় ঘোষণা করলেন:

'প্রসঙ্গ বিচারে দেখি নাহি প্রয়োজন ॥
শ্রীঅঙ্গে শাস্ত্রের লিপি দেখিবারে পাই।
ব্রাহ্মণী বলেন যাহা আমি বলি তাই ॥

এই ঘটনার কিছুদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে একদিন এলেন গৌরী-পণ্ডিত। নামকরা একজন তান্ত্রিক সাধক তিনি। পণ্ডিতও খুব উঁচু দরের। একদিন গদাধর তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, বৈষ্ণবচরণ আমাকে অবতার বলে। এটা কি সত্যি? তোমার কি মনে হয় বলো তো?

—অবতার বলে? তবে তো ছোট কথা বলেছে।

—সে আবার কি ?

—আমার ধারণা, যাঁর অংশ থেকে যুগে যুগে অবতারেরা এই পৃথিবীতে লোককল্যাণ সাধনে এসে থাকেন, যাঁর শক্তিতে তাঁরা ঐ কাজ করেন, আপনি সেই তিনিই।

গদাধর হাসতে হাসতে বলেন, ও বাবা তুমি যে আবার তাকেও ছাড়িয়ে যাও। কেন বলো দেখি ? আমাতে কি দেখছ ?

—যা দেখছি তার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

তোমরা সব এক কথা বলো। কে জানে বাপু আমি তো কিছু জানিনে।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলেন অবতার।

বিচারসভায় বৈষ্ণবচরণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন সেই কথা। গৌরী পণ্ডিত বললেন, শুধু অবতার নন পূর্ণ অবতার।

দক্ষিণেশ্বর আজ তাঁকেই তো বুকে ধারণ করে ধন্য, মনে মনে ভাবেন মথুর বাবু।

পাঁচ

ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবার গুরু হলেন গদাধরের।

হাতে-কলমে শেখালেন তাঁকে তন্ত্রের কঠোর সাধনা।

তন্ত্র সাধনার পথে তিনি যতই অগ্রসর হতে থাকেন, ততই যেন গদাধরের আগের স্বভাবের আমূল পরিবর্তন হতে থাকে। শুধু স্বভাবের নয়, দেহেরও। এখন তাঁর শরীরে রূপ যেন আর ধরে না, অপূর্ব তেজঃপুঞ্জময় হয়ে উঠলো তাঁর সর্বদেহ—সমস্ত শরীরে সৌন্দর্য যেন উথলে পড়ছে। যে দেখে, সে-ই বিমুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকে। লোকে চেয়ে থাকতো বলে, এই সময়ে তিনি সর্বক্ষণ একখানা মোটা চাদর মুড়ি দিয়ে থাকতেন আর তাঁর ইষ্টদেবীর কাছে প্রার্থনা করতেন, মা, বাইরের এই রূপ নিয়ে, আমাকে ভেতরের রূপ দে। মা তাঁর এই প্রার্থনা শুনেছিলেন।

তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন গদাধর।

এবার শিষ্যের পূর্ণ অভিষেকের অনুষ্ঠান হবে। অভিষেকের সময় সাধক শিষ্যের নতুন নামকরণ হয়। তন্ত্রশাস্ত্রের এই নিয়ম।

বিচারসভায়, ভৈরবী বলেছিলেন এবার নিত্যানন্দের খোলে কৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব হয়েছে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি শিষ্যের নতুন নাম রাখলেন—'রামকৃষ্ণ।' এরপর বেদান্ত সাধক তোতাপুরী তাঁকে 'পরমহংস' বলে অভিহিত করেন। এই দুটো মিলিয়ে তাঁর নাম হলো রামকৃষ্ণ পরমহংস। মুছে গেল তাঁর আগেকার পরিচয় গদাধর।

কঠোর তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ রামকৃষ্ণের অলৌকিক সাধক জীবনের শেষ কথা নয়। 'যত মত তত পথ'—এই পরম সত্যের সন্ধান দিয়ে ধর্ম জগতে যিনি যুগান্তর আনবেন, তাঁকে সাধনায় সকল পথ, সকল মত তন্ন তন্ন করে দেখতে হয়েছিল। এক-আধ বছর নয়, পুরো বারোটি বছর ধরে চলেছিল তাঁর সাধনা। দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে তিনি একে একে আকর্ষণ করে এনেছিলেন সাধন পথের সকল অভিজ্ঞ পথিককে।

তন্ত্র সাধনার পর চললো কিছুদিন কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের সাধনা। অপূর্ব এই সাধনা। একদিন দেখা গেল তিনি কয়েকটি টাকা ও খানিকটা মাটি হাতে নিয়ে, টাকা মাটী, মাটী টাকা—এই বলতে বলতে মাটীর সঙ্গে টাকাগুলি গঙ্গার জলে বিসর্জন দিলেন। অর্থ তুচ্ছ হয়ে গেল মাটীর ঢ্যালার মতো। সেই থেকে রামকৃষ্ণ জীবনে আর টাকা ছুঁতে পারতেন না। তেমনি স্ত্রীলোক মাত্রেই তাঁর কাছে মনে হলো মাতৃবৎ। রমণীর মধ্যে তিনি উপলব্ধি করলেন বিশ্ব-জননীর প্রকাশ। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার পর থেকে রামকৃষ্ণ কোনো স্ত্রীলোককে, এমন কি নিজের বিবাহিতা পত্নীকেও স্ত্রীরূপে দেখতেন না।

এইবার সাধক অগ্রসর হন সর্বজীবে শিবজ্ঞান লাভ করার পথে। শুরু হয় দীনতা ও নিরহঙ্কার প্রকাশের আশ্চর্য সাধন। আদর্শ সাধনাও বটে। যে স্থানে কেউ পা দিতে সংকোচ বোধ করে, অথবা হঠাৎ গিয়ে পড়লে স্নান না করে নিজেকে শুচি শুদ্ধ মনে করতে পারে না,

রামকৃষ্ণ নির্বিকার চিত্তে সেই অস্পৃশ্য অপবিত্র স্থান নিজের হাতে মার্জনা করতেন। শুধু তাই নয়। চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট পাতা মাথায় তুলে নিয়ে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে জন্মগত জাতি-অভিমানের মূলে কুঠারাঘাত করতেন। দূর হয়ে যায় ভেদ বুদ্ধি। হৃষ্টমনে কাঙালীদের উচ্ছিষ্ট খেতে এতটুকু বাধে না তাঁর—মহাপ্রসাদ জ্ঞানে তা মাথায় তুলে নিয়ে আনন্দে নৃত্য করেন তিনি।

এইসব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখে, এইরকম সৃষ্টিছাড়া আচরণ দেখে হৃদয় একদিন না বলে থাকতে পারল না, আচ্ছা মামা, তুমি না জগদম্বার পূজারী, তবে এইসব অনাচার করছ কেন?

—অনাচার কিরে শালা? আচার অনাচার বলে কিছু নেই; ওসব মিথ্যা। জানিস নে রামপ্রসাদ বলেছেন:

শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে করে শুবি।
দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি॥

—ঐ যে সেদিন তুমি মেথরের খাওয়া এঁটো পাতাখানা মাথায় তুলে নিলে, এটা কি অনাচার নয়? ওরা তো অস্পৃশ্য।

—ওরে হৃদু, সংসারে অস্পৃশ্য বলে কেউ নেই রে—সবই সেই সচ্চিদানন্দের অংশ।

এই ছিল রামকৃষ্ণের সর্বজীবে শিবজ্ঞানের বিচিত্র সাধনা।

এবার আর একধাপ—প্রকৃতি সাধনা। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে শান্ত, দাস্য, সখ্য, মধুর প্রভৃতি ভাবসাধনের কথা। সে শুধু কথার কথা কিনা তা জানতে চাইলেন, বুঝতে চাইলেন রামকৃষ্ণ। সখ্যভাবের সাধনা আর দাস্যভাবের সাধনা তিনি আগেই করেছিলেন। এইবার তিনি নিজেকে মায়ের সখীরূপে কল্পনা করলেন। চামর হাতে মায়ের মন্দিরে সেইভাবে ব্যজন করেন, কখনো কখনো ঠিক স্ত্রীলোকের বেশ পরিধান করে দেবীর সেবা-পূজা করতেন। তখন তাঁর মনের মধ্যে প্রকৃতিভাব এমন ফুটে উঠেছিল যে, তিনি যে পুরুষ, এ-কথা ভুলেই যেতেন। হাব-ভাব, চলন-বলন সব ঠিক স্ত্রীলোকের

মতো হয়েছিল এই সময়। যে দেখতো, সেই অবাক হয়ে যেত।

এইভাবে যখন তিনি সাধনা করছিলেন তখন একদিন দক্ষিণেশ্বরে এলেন বিগ্রহ-সাধক জটাধারী। রামাইত সাধু। শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন তাঁর ইষ্টদেবতা। রামচন্দ্রের বালমূর্তিই ছিল তাঁর উপাস্য। জটাধারীর যেমন ভক্তি, তেমনি বিশ্বাস। তেমনি তাঁর সেবার নিষ্ঠা। বিগ্রহটির নাম রামলালা। চিরকাল এর সেবা করে এসেছেন তিনি। যা ভিক্ষে পেতেন রেঁধে-বেড়ে তাঁকে ভোগ দিতেন। শুধু তাই নয়। সাধু যেন দেখতে পেতেন তাঁর রামলালা সত্যিসত্যিই খাচ্চে, অথবা কোন একটা জিনিস খেতে চাইছে, কখনো বা বেড়াতে যেতে চাইছে, আব্দার করছে। সেই রামলালা জটাধারীর কাছ থেকে এসেছিল রামকৃষ্ণের কাছে।

এই ধাতুময় বিগ্রহ নিয়ে জটাধারী সর্বক্ষণ উন্মত্ত থাকতেন। হৃদয় কিন্তু সাধুটিকে দেখে যেমন অবাক হলো, তেমনি উদ্বিগ্ন হলো। একে তো সে তার মামাকে নিয়ে অস্থির, এখন এ আবার কোন পাগল এলো? পাগলই তো, নইলে ধাতুময় বিগ্রহকে জীবন্ত মনে করে, কেউ বলে—খাও বাপ, খাও। রাগ করো না। আজ এই খাও, কাল ক্ষীরের লাড্ডু এনে দেব। কখনো বলেন, ওরে, ওরে, কাঁটাবনে কোথায় ছুটে চলেছিস, গা ছড়ে যাবে যে এখুনি। আবার কখনো বলেন, তোর জন্যে যে জ্বালাতন হলাম, আমার জপতপ, ধ্যান-ধারণা সব গোল্লায় গেল। সর্বস্ব ত্যাগ করে তোকে নিয়ে বেরিয়েছি, ভিক্ষে করে এনে তোকে খাওয়াচ্ছি, তবুও তোর মন পাইনে রে।

সাধুর মুখে এই ধরনের সব কথা শুনে হৃদয় মনে মনে হাসে আর ভাবে, এসব ছেলেখেলা নয়ত কি?

—মামা, পাগলের সঙ্গে তুমিও পাগল হলে নাকি?

—তুই কি বুঝবিরে জটাধারীর এইসব কার্যকলাপ?

—বিগ্রহকে জীবন্ত মনে করা পাগলামি ছাড়া আর কি?

—আমি তা মনে করিনে, হৃদু। জটাধারী গোপাল-মন্ত্রে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করেছেন। স্বয়ং ঈশ্বর তাই বিগ্রহ-শরীরে সাধুর সেবার গ্রহণ ছলে এইরকম বালসুলভ লীলা করছেন।

হৃদয় আর তর্ক করে না। রঘুবীর তাঁদের কুলদেবতা। রামকৃষ্ণ তাই আগে থেকেই রাম-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। এইবার তিনি ঈশ্বরকে বালকরূপে দেখবার জন্য অস্থির হলেন। এ অস্থিরতা জটাধারীর প্রভাবেই হয়েছিল। কি এক আকর্ষণে রামকৃষ্ণ বসে থাকেন জটাধারীর বাল-বিগ্রহটির পাশে, কেমন করে কোথা দিয়ে সময় চলে যায়, বুঝতেই পারেন না। ঐ উজ্জ্বল ধাতু-বিগ্রহটি তাঁকে যেন বাৎসল্যভাবে অভিভূত করে সর্বক্ষণ নিজের কাছেই ধরে রাখতে চায়। এরপরেই একদিন রামকৃষ্ণ সাধুকে বললেন, আমাকে দীক্ষা দাও।

শুভদিনে গোপাল-মন্ত্রে রামকৃষ্ণকে দীক্ষা দিলেন জটাধারী। অল্প দিনের মধ্যে একাগ্র সাধনার ফলে ঐ মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করলেন তিনি। কিন্তু তার চেয়েও একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখা গেল। দীক্ষার পর রামকৃষ্ণের মনে হলো রামলালা যেন জটাধারীর কাছে আর থাকতে চায় না। সে এখন তাঁর বুকের মধ্যে আসন পাততে চায়। ক্রমে জটাধারীও বুঝতে পারেন যে, তাঁর আজীবনের পূজিত বিগ্রহ এখন তাঁকে ছেড়ে রামকৃষ্ণের কাছে থাকতে ব্যগ্র। ছল ছল চোখে তিনি দেখেন, তাঁকে ফেলে তাঁর রামলালা ছুটে চলেছে রামকৃষ্ণের পিছু পিছু। তারপর একদিন বিগ্রহটি শিষ্যের হাতে তুলে দিয়ে সাধু জটাধারী বিদায় নিলেন।

একে একে কয়েকটি ভাবের সাধনা শেষ হলো।

এইবার এলেন বেদান্ত-সাধক শ্রীমৎ তোতাপুরী। জটাজুটধারী, দীর্ঘাকৃতি তেজঃপুঞ্জকলেবর এক উলঙ্গ সন্ন্যাসী। ঠিক এই সময়ে রামকৃষ্ণের অন্তরে জেগেছে অদ্বৈতভাবসাধনের প্রবল ইচ্ছা। সেই সাধনার পথ তাঁকে দেখাবার জন্যেই যেন দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত

হলেন ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরী। দেখামাত্রই তোতা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, ঠিক সেই ভাবে আকৃষ্ট হলেন তিনি। তারপর সামান্য আলাপেই তাঁর মনে হলো, এই তরুণ সাধক বেদান্তসাধনের উত্তম অধিকারী। নানা তীর্থস্থান ঘুরে তোতাপুরী এলেন দক্ষিণেশ্বরে—কে যেন তাঁকে এখানে টেনে নিয়ে এলো। মুক্ত সন্ন্যাসী তিনি, কোথাও তিনদিনের বেশি থাকেন না। এখানেও তিনদিন মাত্র থাকবেন ঠিক করেছিলেন।

তোতাপুরী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। সাকার পূজায়, মানে প্রতিমা পূজায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি যখন তাঁর ভাবী শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন, যে বেদান্ত সাধনা করবে কিনা, তখন রামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, তিনি কিছুই জানেন না, তবে তাঁর মা যদি তাঁকে বলেন তাহলে তিনি রাজী আছেন। এই মা বলতে তোতা বুঝেছিলেন রামকৃষ্ণের গর্ভধারী মা। বস্তুত চন্দ্রাদেবী তখন দক্ষিণেশ্বরে ছেলের কাছেই বাস করেছিলেন।

পঞ্চবটীতলে ধুনী জ্বললো।

তোতাপুরী আসন স্থাপন করলেন।

তারপর এক শুভদিনে তোতাপুরী রামকৃষ্ণকে দিলেন বিরজা সন্ন্যাস। প্রেতপিণ্ড অর্পণ করতে হয় নিজের হাতে। রামকৃষ্ণ তাই করলেন। হোমের পবিত্র আভায় রাঙিয়ে উঠলো পঞ্চবটী। সর্বস্ব ত্যাগের ব্রহ্মমন্ত্রে মুখরিত হয়ে ওঠে পঞ্চবটী উপবন। আজ অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন মাতৃমন্ত্রের সাধক—চলেছেন তিনি সাকার থেকে নিরাকারের সীমাহীন পথে। গুরু উপদেশ দিলেন, নামরূপের গণ্ডী ছাড়িয়ে যাও, নির্বিকল্প আত্মধ্যানে ডুবে যাও। কিন্তু শিষ্যের পক্ষে সহজ হয় না গণ্ডী ছাড়িয়ে যাওয়া। ধ্যান করতে বসে যত চেষ্টা করেন ততই যেন তাঁর মানসপটে ভেসে ওঠে জগদম্বার উজ্জ্বল মূর্তি। একদিন তিনি সরল মনে তোতাকে বলেন, হোলো নি গো।

কেঁও হোগা নেহি। তীব্র তিরস্কার তোতার কণ্ঠে।

এই বলে কুটীরের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকিয়ে এক টুকরো ভাঙা কাচ দেখতে পেলেন তিনি। তুলে নিলেন সেটা তাঁর হাতে। যে দিকটা সূঁচের মতো তীব্র সেই দিকটা তিনি রামকৃষ্ণের দুটি ভুরুর ঠিক মাঝখানটায় সজোরে ফুটিয়ে দিলেন। বললেন, মনকে এইখানে গুটিয়ে আনো। তখন রামকৃষ্ণ আবার দৃঢ় সংকল্প করে ধ্যানে বসলেন। অমনি ভেসে ওঠে জগদম্বার সেই প্রভাময়ী দিব্য মূর্তি। তখন জ্ঞানকে অসি কল্পনা করে তাই দিয়ে মনে মনে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন সেই মূর্তি। অমনি সাধকের মন হুহু করে সমস্ত নাম রূপ রাজ্যের ওপর উঠে গেল। তিনি সমাধি মগ্ন হলেন। তিন দিন এইভাবে কেটে যায়। তোতা দেখে বিস্মিত হন। চল্লিশ বছরের কঠোর সাধনায় তিনি যা উপলব্ধি করেছেন, এই নবীন বাঙালীসাধক তিন দিনে তা আয়ত্ত করলেন। এ কি কেউ কখনো শুনেছে, না দেখেছে? তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে রয়ে গেলেন পুরো একটা বছর।

এরপর থেকে রামকৃষ্ণ দিন রাত গুরুর সঙ্গে বেদান্তের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন, প্রসঙ্গ তুলতেন না। সর্বক্ষণ অদ্বৈতভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। তোতা রোজই নিয়ম মতো ধ্যানে বসতেন। একদিন শিষ্য তাঁর গুরুকে প্রশ্ন করেন, তুমি তো ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তবে রোজ রোজ ধ্যান করো কেন?

—রোজ ধ্যান করলে মন শুদ্ধ থাকে, ময়লা ধরে না। যেমন আমার এই পিতলের লোটা, রোজ না মাজলে ময়লা ধরে।

—কিন্তু লোটা যদি সোনার তৈরী হয়।

তোতার মুখে আর কথা নেই। ভাবলেন, সত্যিই তো।

আর একদিন। রামকৃষ্ণ হাততালি দিয়ে হরিনাম করছেন। তোতার কানে গেল। অমনি তিনি আসন থেকে উঠে এসে ধমকে বলেন, আরে, কেঁও রোটি ঠোকতে হো?

—কালা নাকি? শুনতে পাচ্ছ না ঈশ্বরের নাম করছি।

—ঈশ্বরের নাম করছ তো হাতে তালি দিচ্ছ কেন?

—যে দেওয়াচ্ছে সেই জানে। ওসব ভাবের ব্যাপার, তুমি বুঝবে না।

—ব্রহ্মই তো সব।

—মানলুম, কিন্তু তার সঙ্গিনী যে মায়া সেই তার শক্তি। সে খবর তুমি রাখো না, তুমি ব্রহ্ম নিয়েই মেতে আছ।

—আমি এই ধুনীর আগুনের মতো—ভাবহীন, মায়ারহিত, কঠিন। আমি নির্বিকার।

—তুমি শুধু বিচার করে, তর্ক করে ঈশ্বরকে খুঁজছ—এই পর্যন্ত তোমার দৌড়। কিন্তু ঈশ্বরকে যে ভালবাসা যায়, তাঁর জন্য কাঁদতে পারা যায়, নাচতে পারা যায়, তাঁর কথা কীর্তন করে বলা যায়, এসব তোমার ধারণার বাইরে।

—নেহি কভি নেহি।

এমন সময়ে অঘটন-ঘটন পটিয়সী মায়া এক কাণ্ড করে বসলেন। সামনে ধুনী জ্বলছে। হঠাৎ তোতা তাকিয়ে দেখেন, মন্দিরের এক ভৃত্য ধুনী থেকে একখানা জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিচ্ছে। অমনি ধুনীর আগুনের মতোই তিনি জ্বলে উঠলেন। পাশেই ছিল চিমটা সেটা তুলে নিয়ে তোতা তাকে আক্রমণ করলেন। তাঁর বৈদান্তিক গুরুর আচরণ দেখে রামকৃষ্ণ আর স্থির থাকতে পারলেন না। বললেন, দূর শালা। এই না বলছিলি—সব ব্রহ্ম; ব্রহ্মময় এই জগৎ।

তোতার মুখে কথা নেই। হাতের চিমটে ফেলে তিনি স্তব্ধভাবে আবার আসনে বসে পড়লেন। একটা শিক্ষা হলো আজ তাঁর শিষ্যের কাছে। এরপর একদিন গভীর রাত্রে জগজ্জননীর ভাস্বর প্রকাশ দর্শন করে কৃতার্থ হলেন তিনি। সাকারে বিশ্বাস হলো তাঁর। অমন যে কঠোর, কঠিন বৈদান্তিক, তাঁর মুখখানি এখন যেন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। অকপটে স্বীকার করলেন, তাঁর সাধনা এতদিনে পূর্ণ হলো, সার্থক হলো। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে তিনি দক্ষিণেশ্বর

থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে শিষ্যকে 'পরমহংস' বলে ঘোষণা করে গেলেন।

একে একে তন্ত্র সাধন, মধুরভাবের সাধন ও বেদান্ত সাধনের পর সাধকের মন এইবার গেল ইসলাম ধর্মসাধনের দিকে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে এলেন এক সুফী সাধক। নাম তার গোবিন্দরাম। ইনি নির্জনে বহুকাল সাধনা করে সুফী ধর্মের সর্বোচ্চ তত্ত্ব জানতে পেরেছিলেন। এঁর সঙ্গে আলাপ করে রামকৃষ্ণ মুগ্ধ হলেন এবং ক্রমে এই কালীসাধকের মন ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করতে থাকে। একদিন তিনি গোবিন্দকে বললেন, আমাকে তোমাদের ধর্মে দীক্ষা দাও। এটাও তো ঈশ্বরলাভের এক পথ। তারপর এক শুভদিনে শুভক্ষণে পঞ্চবটীতে গোবিন্দ তাঁকে যথাবিধি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। শুরু হয় তাঁর আর একটা সাধনা।

এই সময়কার সাধনার কথা পরমহংসদেব নিজেই এই ভাবে বলেছেন 'ঐ সময় আল্লা-মন্ত্র জপ করতাম, নিয়ম করে দিনে পাঁচবার নমাজ পড়তাম। মন থেকে হিন্দুভাব একবারে মুছে গেল। মায়ের মন্দিরের ত্রিসীমানা দিয়ে হাঁটতাম না, কোন হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তির দিকে চাইতাম না। প্রণাম করা তো দূরের কথা কাছা না দিয়ে কাপড় পড়তাম। এইভাবেই তিন দিনের মধ্যেই ইসলাম ধর্মের তত্ত্ব সব উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। এমন কি এইসময়ে একদিন এক দীর্ঘ, শ্মশ্রুবিশিষ্ট জ্যোতির্ময় পুরুষের দিব্য দর্শন লাভ করেছিলাম। ইনিই ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ।

এইখানেই রামকৃষ্ণের সাধনার শেষ। সকল মতের সাধনা করে যখন তিনি সর্বসিদ্ধিলাভ করলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র বত্রিশ বছর। যত মত তত পথ—এই মহাসত্য আবিষ্কার করলেন তিনি। উপলব্ধি করলেন—সকল ধর্মের মূলে রয়েছে ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিশ্বাস ও ভক্তি। বুঝলেন—ঈশ্বর কথার কথা মাত্র নন, একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য তিনি।

তাঁর এই বিচিত্র উপলব্ধির মধ্যে জন্ম নিলো ভারতের ধর্ম জগতে এক নতুন চেতনা। সেই চেতনার অমৃত ধারাকে পরবর্তী কালে দেশে-বিদেশে ভগীরথের মতো কেমন করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর মানসপুত্র স্বামী বিবেকানন্দ, সে ইতিহাস তোমরা জানতে পারবে যখন এই বীর সন্ন্যাসীর জীবনী তোমরা পাঠ করবে।

বিয়ের পর একে একে কেটে গেছে আটটি বছর।

বালিকা বধুর জীবনের আটটি মধুর বসন্ত কেটে গেছে স্বামীর কাছ থেকে দূরে অবস্থান করে। আট বছর বাদে গদাধর নয়, রামকৃষ্ণ এলেন কামারপুকুরে। তিনি এখন সিদ্ধ সাধক। সঙ্গে ভৈরবী যোগেশ্বরী আর ভাগ্নে হৃদয়। তাঁর সমস্ত জিনিস পত্র গুছিয়ে দিলেন মথুরাবাবু, পাছে সেখানে গিয়ে বাবার কোন রকম অসুবিধা হয়। দেবীর সেবাপূজার ভার রইল অক্ষয়ের ওপর। অক্ষয় রামকৃষ্ণের অগ্রজ রামকুমারের একমাত্র পুত্র এবং খুব স্নেহের পাত্র।

কামারপুকুরে আবার আনন্দের হাট বসলো অনেককাল বাদে। গদাধরকে তাঁদের মধ্যে পেয়ে সকলেই আনন্দে অভিভূত হলেন। বধু সারদাকে বাপের বাড়ি থেকে এখানে আনা হলো। বিয়ের পর স্বামীকে এই প্রথম দেখলেন তিনি। সেদিনের ছয় বছরের বালিকা আজ চৌদ্দ বছরের কিশোরী। বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর একটা কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্য পালনে এবার তৎপর হলেন রামকৃষ্ণ। সাধক স্বামীর দিব্য সঙ্গে সারদা দেবীর বধূজীবনের সাতটি মাস অতিবাহিত হয়। এই সময়ে তিনি খুব যত্নের সঙ্গে স্বামীর পরিচর্যা করেন। আর অন্যদিকে রামকৃষ্ণ তেমনি যত্নের সঙ্গে, আগ্রহের সঙ্গে সারদাদেবীকে সংসারধর্ম সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দিলেন। কেমন করে দেবতা, গুরু, অতিথির সেবা করতে হয়, টাকা-পয়সার সদ্ব্যবহার করতে হয়, সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে হয়—এইসব বিষয়ে যথাযথ শিক্ষা তিনি বধূকে দিলেন। তাঁর স্বামীর আদর্শ জীবনের উত্তাপ সারদাদেবী যেন তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আজ অনুভব করলেন।

অনুভব করলেন তাঁর হৃদয়ের মধ্যে যেন আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত হয়েছে।

ঘর-সংসারের কথা থেকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্যন্ত সকল বিষয় রামকৃষ্ণ তাঁর স্ত্রীকে শিক্ষা দিলেন! যেমন আদর্শ স্বামী রামকৃষ্ণ, তেমনি আদর্শ সহধর্মিণী সারদাদেবী। পত্নীকে তিনি বসিয়েছিলেন জগজ্জননীর আসনে—বিবাহিতা পত্নীকে তিনি পূজার নির্মাল্যের মতো জ্ঞান করতেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত এই প্রথম।

ছয়

সাতমাস পরে কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে ফিরলেন রামকৃষ্ণ। এসে শুনলেন মথুরাবাবু সস্ত্রীক তীর্থযাত্রার আয়োজন করেছেন। তিনি রামকৃষ্ণকে সঙ্গে নিতে চাইলেন। সরল বালকের মতো রামকৃষ্ণ নহবতের ঘরে এসে তাঁর মা চন্দ্রাদেবীকে বলেন, মা, সেজবাবু বলছেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থে যাবেন। তুমি কি বলো? চন্দ্রাদেবী মত দিলেন; তবে হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে যেতে বললেন। আর বলে দিলেন গয়া না যেতে।

তারপর ফাল্গুন মাসের কোন একদিনে তাঁরা সকলে শুভযাত্রা করে তীর্থ দর্শনে বেরুলেন। দাস দাসী, পাচক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সঙ্গে চললো প্রায় একশো লোক। রেলকোম্পানীর কাছ থেকে একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর ও তিনখানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করে নেওয়া হলো। তীর্থ-যাত্রী দল প্রথমে এলেন বৈদ্যনাথ ধাম। এখানে নিকটবর্তী গ্রামের দরিদ্রলোকদের কষ্ট দেখে রামকৃষ্ণ যারপর নাই ব্যথিত হলেন। দেখলেন তারা সকলেই যেন।

অন্নবিনা জীর্ণ-শীর্ণ রুগ্ন কলেবর।
অনায়াসে গোনা যায় বুকের পাঁজর।

পরিধেয় শতগ্রন্থি মলিন বসন।
এত খাটো তাতে নাহি লজ্জা নিবারণ॥

তাদের এই দুরাবস্থা দেখে ব্যথায় কাতর হয়ে রামকৃষ্ণ কেঁদে ফেললেন। মথুরকে ডেকে বললেন, এমন কাঙালী কখনো তো দেখিনি। এদের মধ্যে তুমি যথাসাধ্য অন্ন-বস্ত্র বিতরণ করো। রামকৃষ্ণের কথা মথুরের কাছে বেদবাক্যের তুল্য। তাঁর সামান্য একটি ইচ্ছা পূর্ণ করতে তিনি কখনো কুণ্ঠিত হতেন না। কিন্তু এখন যে তিনি তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছেন, রাস্তায় কত টাকা খরচ হবে। এই হাজার হাজার লোকের মধ্যে অন্ন-বস্ত্র বিতরণ করবার টাকা তিনি কোথায় পাবেন।

মথুরের এই কথায় রামকৃষ্ণ ক্ষুন্ন হলেন। বললেন, আমি আর কাশী যাব না, মথুর। এখানে এই কাঙালীদের মধ্যে থাকব। তাঁর যে কথা, সেই কাজ। অমনি গিয়ে বসেন সেইসব কাঙালীদের মধ্যে। তখন মথুর বলেন, বাবা, আমার অপরাধ হয়েছে। আমি এখনি এদের সেবার আয়োজন করছি।

মায়ের তবিলদার তুমি, মথুর। খুব যত্ন করে কাঙালী ভোজন করাও। এদের প্রত্যেককে নগদ টাকা দাও, নতুন কাপড় দাও।

মথুরাবাবু সেই মত ব্যবস্থা করলেন। এক সপ্তাহকাল ধরে দরিদ্র নরনারীকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করালেন আর কাঙালীদের প্রত্যেককে টাকা ও নতুন কাপড় দান করলেন। রামকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হলেন। তারপর সেখান থেকে তীর্থযাত্রীদল এলেন কাশী। শিবধাম বারাণসী। কেদারঘাটের কাছে দুখানা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন মথুরবাবু। পূজা, দান প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি এমন মুক্তহস্তে দান করতে লাগলেন যে 'রাজাবাবু' বলে কাশীতে তাঁর খ্যাতি রটে গেল। ভাবময় রামকৃষ্ণ গঙ্গা বক্ষ থেকে নৌকায় চড়ে কাশীর সৌন্দর্য দেখে কত আনন্দ পেতেন। বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন করতে গিয়ে তাঁর ভাবসমাধি হলো। 'জয়বাবা বিশ্বনাথ' বলে আনন্দে করতালি দিয়ে নাচতে থাকেন। তাঁর এই

ভাবাবেশ দেখে সবাই বিস্মিত হয়। একদিন মণি-কর্ণিকার মহাশ্মশানে গিয়ে দর্শন করলেন কাশীর সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে নিজের হাতে তাঁকে খাওয়ালেন পায়সান্ন। যত সিদ্ধ সাধক এখানে তখন বাস করতেন তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ করলেন। আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীও বাদ যাননি।

মণি-কর্ণিকার ঘাটে শবদাহ কেমন করে হয় তা দেখবার জন্য একদিন হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে রামকৃষ্ণ গেলেন নৌকায় চড়ে। শ্মশান-ঘাটে নৌকা লাগাবার আগেই তিনি বাইরে এসে সমাধিস্থ হলেন। পাছে মামা পড়ে যান তাই হৃদয় তাঁকে ধরে রইলো। রামকৃষ্ণ ভাবচক্ষে দেখলেন রজতধবল মহাদেব সেই ঘাটে গম্ভীর মূর্তিতে দাঁড়িয়ে। তিনি নিজেই বলছেন :

সেথায় দেখিনু এক মূর্তি দীর্ঘকায়॥
পিঙ্গল বর্ণের কণ্ঠ শোভে শিরোপরে।
অঙ্গেতে রজত কান্তি, ত্রিশূল শ্রীকরে॥
ধীরমন্দ পদক্ষেপে গম্ভীর ধারায়।
প্রত্যেক চিতার পাশে বেড়িয়া বেড়ায়॥
প্রত্যেক চিতার প্রতি দেহীটিকে তুলে।
তারক ব্রহ্ম-মন্ত্র তার দেন কর্ণমূলে॥

কাশী দর্শন হলো। এবার নিজধাম শ্রীবৃন্দাবন।

বৃন্দাবনে এসে রামকৃষ্ণ আকুল হয়ে কেঁদে বললেন, সবই সেই আছে—কৃষ্ণ রে। কেবল তোমাকেই দেখতে পাচ্ছি না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি লীলাস্থল—সেই শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্ধন, সেই কেশী-ঘাট, বংশীঘাট—দেখে তাঁর সর্বশরীরে জাগে হর্ষ, রোমাঞ্চ। যে ঘাটে বসুদেব সেই ঘোর দুর্যোগময়ী রাত্রিতে কংসের কারাগার থেকে সদ্যোজাত কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে গোকুলে গিয়েছিলেন, সেই ঘাটে উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। ভাবচক্ষে

তিনি যেন দেখতে পেলেন উদ্বিগ্ন বসুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করে ঊর্ধ্বশ্বাসে তরঙ্গপূর্ণ যমুনা পার হচ্ছেন।

বৃন্দাবনে তখন এক সিদ্ধ সাধিকা বাস করতেন। নাম গঙ্গামাতা। অনেক বয়স হয়েছে তাঁর। আশীর ওপর হবে, কিন্তু মুখের কমনীয়তা যেন একটি আট বছরের মেয়ের মতো। সেই গঙ্গামাতাকে দর্শন করতে এলেন একদিন রামকৃষ্ণ তাঁর কুঞ্জে। পরমহংসদেবকে দেখেই তিনি যারপরনাই আনন্দবোধ করলেন। যেন কত আপনার জনকে দেখছেন। আনন্দের আতিশয্যে বলেন মেরি ব্রজদুলালী, ও মেরি লতেলি, আজ মেরা বড়া ভাগ্ হ্যায় যো তোমরা দর্শন মিলা। কিন্তু কে শুনছে স্নেহ-প্রীতিমাখা সেই সম্ভাষণ? রামকৃষ্ণ ততক্ষণে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছেন।

সমাধি ভাঙলে মধুমাখা স্বরে গঙ্গামাতা বলেন, বাবা, তুমি এখানেই থেকে যাও। অমনি রামকৃষ্ণ বলেন, বেশ, তাই থাকব। দিন যায়। গঙ্গামাতার আদর যত্নে সরল-স্বভাব রামকৃষ্ণের মন থেকে দক্ষিণেশ্বরের স্মৃতি যেন মুছে যাবার উপক্রম হলো। তাই দেখে মথুরাবাবু তখন হৃদয়কে বলেন্ হৃদয়, বাবার ভাবগতিক দেখে আমার ভাল লাগছে না। বাবাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো। গঙ্গামাতা কিছুতেই ছাড়বেন না, তখন হৃদয় বলে, মামা, ওখানে যে দিদিমা রয়েছেন। অমনি রামকৃষ্ণের মনে পড়লো নহবতের ঘরে তাঁর গর্ভধারিনী মা রয়েছেন। তখন গঙ্গামাতার অনুরোধ ভেসে গেল।

বৃন্দাবন থেকে আবার কাশীতে এলেন তীর্থযাত্রীদল। বিশ্বনাথের শৃঙ্গারবেশ দেখলেন রামকৃষ্ণ। একদিন মদনপুরায় গিয়ে মহেশ সরকারের বীণা বাজানো শুনলেন। তাঁর মতো বীণ বাদক তখন আর কেউ ছিলেন না। নিবিষ্টমনে বীণার আলাপ শুনতে শুনতে সুরের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ গান গাইতে লাগলেন। সেই কিন্নর কণ্ঠ শুনে বীণ বাদক তো অবাক। তীর্থভ্রমণ শেষ হলো। কাশীতে দান ধ্যান করে মথুর সদলে ফিরলেন কলকাতায়। পথেই তীর্থরাজ

গয়া। মথুরের ইচ্ছা গয়া দর্শন করেন। রামকৃষ্ণ রাজী হলেন না। বললেন, না, সেজবাবু আমার গয়া যাওয়া হবেনি। মায়ের নিষেধ আছে। যেখান থেকে এসেছি সেখানে গেলে শরীরটা থাকবেনি গো। তখন সকলে কাশীধাম থেকে দক্ষিণেশ্বরে ফিরলেন।

তীর্থদর্শন করে ফিরবার পর একে একে আরো তিনটি বছর কেটে যায়। এই সময় একবার রামকৃষ্ণ কালনা ও নবদ্বীপ দর্শনে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন মথুর ও হৃদয়। যেখানেই যান, হৃদয়ের সঙ্গে থাকা চাই। সে নইলে তার মামাকে দেখবে কে? দক্ষিণেশ্বর থেকে গঙ্গাপথে নৌকা করে তাঁরা প্রথমে কালনা, পরে এলেন নবদ্বীপধাম। কালনায় তখন ভগবানদাস বাবাজী নামে এক সিদ্ধ মহাপুরুষ বাস করতেন। হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে বাবাজীকে দর্শন করতে এলেন রামকৃষ্ণ।

তখন সকাল বেলা। বাবাজী জপ করছিলেন। বয়স আশীর কাছাকাছি; ফর্সা রং, মাথা কামানো, মাঝখানে টিকি। দুজনে কাছে এসে প্রণাম করে বসলেন। বাবাজী জিজ্ঞাসা করেন, কোথা থেকে আসছেন? হৃদয় উত্তর দিলো, কলকাতা থেকে। রামকৃষ্ণকে দেখে বাবাজীর মনে হলো ইনি যেন সাক্ষাৎ মহাপ্রভু। তৎক্ষণে রামকৃষ্ণের ভাব সমাধি হয়েছে। সেই অবস্থায় তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি ভগবান দাস?

আমি আপনার দাস প্রভু। করজোড়ে বলেন বাবাজী।

বাবাজীর আশ্রমের দুরবস্থা দেখে তিনি মথুরকে বলেন, এঁর সেবার জন্য কিছু টাকা দান করো। মথুর দিলেন একশো টাকা। কালনা থেকে তাঁরা এলেন শ্রীধাম নবদ্বীপে। নৌকা নবদ্বীপের কাছাকাছি হওয়া মাত্র রামকৃষ্ণ বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ভাবনেত্রে তিনি যেন দেখতে পেলেন দুটি অতি সুন্দর কিশোর, গলায় ফুলের মালা, আকাশ পথে নাচতে নাচতে আসছে তাঁর দিকে। কিশোর দুটি এসে তাঁর দেহের মধ্যে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ ডুবে যান সমাধির

মধ্যে। সেই সমাধির ঘোর কাটলো নবদ্বীপে উপস্থিত হবার পর। ঘাটে নেমে, ঘুরে ঘুরে আখড়াগুলি দেখলেন, কিন্তু কোথাও তাঁর ভাবাবেশ হলো না। ফিরে এলেন ঘাটে। মথুরকে বললেন। দেখলুম সে-সব স্থান আর নেই। লোপ পেয়ে গেছে।

মায়ের রসদদার, রামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ সেবক মথুরাবাবু মারা গেলেন। চৌদ্দবছর তিনি তাঁর সেবা করেছিলেন। রোগশয্যা থেকে মথুর লোক পাঠিয়ে কাতর প্রার্থনা জানালেন। ঠাকুরকে একটিবার দেখবেন তিনি। হৃদয় বলে, মামা, একটিবার সেজবাবুকে গিয়ে দেখে এসো না?

আমি গিয়ে কি করব? তার ফোড়া আরাম করে দেওয়ার শক্তি কি আমার আছে?

রামকৃষ্ণ এলেন একদিন জানবাজারে। ঠাকুরকে দেখে মথুরের আনন্দের সীমা নেই। অনেক কষ্টে উঠে তাকিয়া ঠেক দিয়ে বসলেন। বললেন, বাবা, একটু পায়ের ধূলো দাও।

—আমার পায়ের ধূলো নিয়ে কি হবে? তাতে তোমার ফোড়া কি সারবে?

বাবা, আমি কি ফোড়া আরামের জন্য তোমার পায়ের ধূলো চাইছি? সেজন্যে তো ডাক্তার আছে? আমি ভবসাগর পার হওয়ার জন্যে তোমার শ্রীচরণের ধূলো চাইছি।

এই কথা শোনা মাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হলেন। সেই অবসরে মথুর তাঁর পায়ে মাথা রেখে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করলেন—তাঁর দুইচোখ বেয়ে দরদর ধারে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে পরমহংসদেব যখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলেন তখন তিনি দেখলেন মথুরের খুব প্রসন্নভাব, রোগের বিন্দুমাত্র যন্ত্রনা নেই সেখানে। সেই সময়ে মথুর তাঁকে বললেন, বাবা, তুমি একদিন আমাকে বলেছিলে যে, আমি যতদিন বাঁচবো, তুমি ততদিন দক্ষিণেশ্বরে থাকবে। আমি তো

চললাম, তবে কি আমার অবর্তমানে আমার পরিজনদের তুমি ত্যাগ করবে ?

রামকৃষ্ণ নীরব রইলেন। মথুর আবার দীনভাবে বলেন, বাবা, দ্বারকানাথ ও জগদম্বাও যে তোমাকে ভক্তি করে। দ্বারকানাথ মথুরের ছেলে। তাঁর কাতরতা দেখে রামকৃষ্ণ আর স্থির থাকতে পারলেন না। বললেন, আচ্ছা তোমার বৌ আর দোয়ারি যতদিন থাকবে আমি ততদিন থাকব দক্ষিণেশ্বরে।

মথুর নিশ্চিন্ত হলেন। আর একটা সংশয় ছিল তাঁর মনে। আজ রোগশয্যায় ঠাকুরকে কাছে পেয়ে তিনি বললেন, কই বাবা, তুমি যে বলেছিলে, তোমার ভক্তরা সব আসবে। তাঁরা কেউই তো এখনো এলেন না ?

কি জানি বাপু। কতদিনে মা তাদেরকে এখানে আনবেন। তারা সব আসবে, একথা মা যে নিজে আমাকে জানিয়েছেন।

ঠাকুরের দিব্য প্রকাশ হবে, ভক্তরা সব আসবে—এই বিশ্বাস নিয়ে ১৮৭১ সালের আষাঢ় মাসের একদিন বিকাল বেলায় কালীঘাটে গঙ্গার তীরে সজ্ঞানে মথুরাবাবু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সেদিন ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণকে হঠাৎ গভীরভাবে নিমগ্ন হতে দেখা গেল।

মথুরানাথের মৃত্যুর ছয় মাসে পরে দক্ষিণেশ্বরে এলেন সারদাদেবী। লোকমুখে তিনি শুনে ছিলেন তাঁর স্বামী পাগল হয়ে গিয়েছেন। এইখবর পেয়ে অবধি তাঁর মনে অশান্তির সীমা ছিল না। তিনি তখন বাপের বাড়ি থাকতেন। বাবাকে বললেন তাঁর মনের কথা। তিনি দক্ষিণেশ্বর যাবেন। বিয়ে হয়ে অবধি মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যায়না। এখন সে বড়ো হয়েছে। তাই আজ তার মুখে এই কথা শুনে রাম মুখুয্যে আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি নিজেই মেয়েকে সঙ্গে করে একদিন যাত্রা করলেন দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশ্যে। পালকি ছুটলো কলকাতার পথে। তখন সারদা দেবীর জ্বর। রাস্তায় জলঝড়ে

মহা দুর্যোগ উপস্থিত হলো পথের অনেক কষ্ট সহ্য করে মেয়েকে নিয়ে রামচন্দ্র যখন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন তখন রাত একটা।

দক্ষিণেশ্বরে এলেন সারদাদেবী। যেন শিবের কাছে এলেন শিবজায়া পার্বতী। অসুস্থা পত্নীকে সাদরে গ্রহণ করলেন রামকৃষ্ণ নিজের ঘরেই একটা পৃথক শয্যায় তাঁর শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থারও ত্রুটী হয় না। শুধু বলেন, এতদিনে তুমি এলে। আর কি আমার সেজবাবু আছেন যে তোমার যত্ন হবে? তিন-চারদিনের মধ্যেই সারদাদেবী আরোগ্য লাভ করলেন। চন্দ্রাদেবী তখন নহবত ঘরে বাস করতেন। ঠাকুর তাঁকে মায়ের কাছে রাখার বন্দোবস্ত করে দিলেন।

সারদাদেবী দেখলেন, না, তাঁর স্বামী পাগলও নন, উন্মাদও নন। পাগল কি নিজের হাতে বৌকে ওষুধ খাওয়ায়, না, তার অমন সেবা-শুশ্রূষা করে? লোকের মুখে শুনে এতকাল যে সন্দেহ তাঁর মনের মধ্যে জেগেছিল, এখন নিজের চোখে সব দেখে সে সন্দেহ দূর হলো। সারদাদেবী বুঝলেন, তাঁর স্বামী আগে যেমন ছিলেন, এখনো ঠিক সেইরকম আছেন। লোকে তাঁর বিষয়ে মিথ্যা কথা রটনা করেছে। দেবতা দেবতাই আছেন। আজ সেই স্বামীর কাছে এসে তাঁর সেবা করতে পারবেন ভেবে তাঁর মনে আনন্দ আর ধরে না যেন।

ঠাকুর বিবাহিত জেনে তোতাপুরী একদিন বলেছিলেন, তাতে কি হয়েছে? স্ত্রী কাছে থাকলেও ত্যাগ, বৈরাগ্য ও বিবেক যার ঠিক থাকে, সে মানুষের সব ঠিক থাকে—এমন কি তার ব্রহ্মও ঠিক থাকে। যার চোখে নারী ও পুরুষ সমান তার আবার ভয় কি? আজ দক্ষিণেশ্বরে এই পরীক্ষারই এক নতুন অধ্যায় উপস্থিত হলো। সেই বিচিত্র কাহিনী এই বার বলব। একদিন তাঁর স্বামীর পদসেবা করছেন সারদাদেবী। তখন সেই সুযোগে তাঁকে কত ভাল ভাল উপদেশ দিলেন রামকৃষ্ণ। সরল মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন স্ত্রী আর

স্বামী এতটুকু বিরক্ত না হয়ে প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিতে থাকেন। শুধু জবাব দেওয়া নয়, তার মর্ম ঠিকমত বুঝতে পারছেন কিনা, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতেন তিনি।

—আচ্ছা, সকলেরই কি ঈশ্বর দর্শন হয়?

—হয় বৈ কি। চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার। তাঁকে ডাকবার অধিকার সকলেরই আছে। যে ডাকবে, তিনি তাকেই দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

—আচ্ছা আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়?

—মনে হয় যে মা মন্দিরে আছেন, যে মা শরীরের জন্ম দিয়েছেন তিনিই নহবতে বাস করছেন। এখন তিনিই আমার পদসেবা করছেন।

—সত্যি বলছ?

—আমি মিথ্যা বলিনে গো। সাক্ষাৎ জগজ্জননীর মূর্তি বলে তোমাকে সর্বদা দেখি—সত্যি দেখি।

এইভাবে কেটে যায় একটি বছর। স্বামী-স্ত্রী কারো মনে জাগেনি বিকার একটি দিনের জন্যেও। ভাঙেনি সংযমের বাঁধ এই দেব-দম্পতীর। ১২৮০ সাল। জ্যৈষ্ঠ মাস। অমাবস্যা। আজ ফল হারিনী কালিকা পূজার পুণ্যদিন। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে প্রতি বছর এই দিনে বিশেষ উৎসব হয়। জগদম্বাকে পূজা করবার মানসে রামকৃষ্ণ আজ বিশেষ আয়োজন করেছেন। এই আয়োজন কিন্তু ভবতারিনীর মন্দিরে না হয়ে তাঁর ঘরেই হলো। কেউ জানে না। পরমহংসদেব বসেছেন পূজায়। পাশেই আলপনা-আঁকা একখানা পিঁড়ি। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাত। তখন নটা বাজে। নহবত ঘরে খবর পাঠিয়ে তিনি সারদাদেবীকে আনালেন তাঁর ঘরে।

সারদাদেবী এলেন। স্ত্রীর হাত ধরে বসালেন তিনি আলপনা আঁকা সেই পিঁড়ির ওপর। স্বামীর দক্ষিণ পাশে বসে আছেন তিনি। বসে আছেন মন্ত্র মুগ্ধার মতো। সামনে মন্ত্র পূত গঙ্গাজলের কলসী। সারদাদেবীর সর্বাঙ্গে সেই জল ছিটিয়ে অভিষেক করলেন তাঁকে।

ছুই পায়ে দিলেন আলতা পরিয়ে। সীমন্তে দিলেন সিঁদুর। পরিয়ে দিলেন একখানি লালপাড় নতুন শাড়ি। এইবার তিনি উচ্চারণ করলেন প্রার্থনা মন্ত্র সর্বশক্তির অধিশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর। এঁর শরীর মনকে পবিত্র করে এঁদেহে আবির্ভূতা হয়ে সর্বকল্যাণ সাধন কর।

তারপর সাক্ষাৎ দেবী জ্ঞানে সারদাদেবীকে ষোড়শ উপচারে পূজা করলেন। নিবেদন করলেন নৈবেদ্য ও ভোগ। নিজের হাতে তাঁর মুখে তুলে দিলেন সেই নিবেদিত ভোগের কিছু অংশ। দেখতে দেখতে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন সারদাদেবী। একটা অপূর্ব অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয় তাঁর সমস্ত দেহ ও মন। রোমাঞ্চ জাগে প্রতি রোমকূপে। ক্রমে সমাধি লাভ করেন তিনি। রামকৃষ্ণের নিজের তখন অর্ধবাহ্যদশা। বিচিত্র সেই দৃশ্য। বিচিত্র সেই অনুভূতি। ছুজনে আত্মস্বরূপে মিলে যেন এক হয়ে গেলেন। কতক্ষণ কেটে যায় এই দিব্যভাবে। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতীত হলো। দেবীকে রামকৃষ্ণ করলেন আত্মনিবেদন। দিলেন তাঁর চরণে তাঁর সমস্ত সাধনার ধন। দিলেন তাঁর জপের মালাটি পর্যন্ত। শেষে প্রণাম করলেন এই বলে ঃ

সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি, নারায়নী নমোহস্তুতে ॥

পূজা শেষ হলো। অদ্ভুত, অপরূপ মহাপূজা।
সহধর্মিনী হলেন জগজ্জননী।
এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে এই প্রথম।
রামকৃষ্ণের অলৌকিক সাধনার পরি সমাপ্তি হলো আজ।
লাভ করলেন তিনি সম্পূর্ণ দেব-মানবত্ব।

এইবার আমরা দেখব তাঁর জীবনের প্রচারলীলা। আত্ম প্রকাশ করে, তিনি করবেন অমৃতবাণী প্রচার—যে বাণী গ্রহণ করবে পৃথিবীর সকল জাতি, সকল ধর্ম আর সকল সম্প্রদায়ের মানুষ

সাত

দিন যায়।

যাদের আশাপথ চেয়ে রয়েছেন দক্ষিণেশ্বরেশ্বর, সেই প্রত্যাশিত ভক্তরা আসেন না দেখে তাঁর ধৈর্যের বাঁধ যে ভেঙে যায়। কোথায় তারা—ঈশ্বর বিশ্বাসী সর্বত্যাগী সত্যাশ্রয়ী সেই ভক্তরা কোথায় ? কবে তারা আসবে তাঁর মনের ব্যাকুলতার সীমা নেই। বিষয়ী লোকের সঙ্গ তখন অসহ্য মনে হতো। মন্দিরে যখন সন্ধ্যা-আরতির শাঁখ-ঘন্টা বেজে উঠতো, তখন কুঠির ওপরে উঠে হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলতেন—তোরা সব কে কোথায় আছিস, আয়রে। তোদের না দেখে আর থাকতে পারছিনা। কোথায় তোরা সব সৈনিক-সন্ন্যাসী, চলে আয়। ওরে, আমি যে তোদের জন্যে কত কথা, কত ভাব, কত ভালবাসা নিয়ে কতদিন ধরে বসে আছি। তোরা চলে আয়, চলে আয়।

দিব্য প্রকাশ আসন্ন হয়ে আসে যুগদেবতার। তাঁর সেই আকুল চিৎকারে ভরে ওঠে দক্ষিণেশ্বরের আকাশ-বাতাস। সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে রামকৃষ্ণ যখন তাঁর ভাবী ভক্ত ও সন্তানদের জন্য

দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করছিলেন, সেই সময়ে একদিন কামারপুকুর থেকে দুঃসংবাদ এলো—তাঁর পিতৃতুল্য অগ্রজ মারা গেছেন। তিনি দেখলেন এই নিদারুণ সংবাদ যদি মায়ের কানে যায়, তাহলে বৃদ্ধা ভীষণ আঘাত পাবেন। অমনি তিনি মন্দিরে গিয়ে ভবতারিণীর কাছে জানালেন কাতর প্রার্থনা—মাগো আমার বৃদ্ধা মাকে এই ভীষণ পুত্রশোক থেকে রক্ষা কর।

ভক্তদের আসা-যাওয়া আরম্ভ হয় এবার।

এলেন সিঁদুরিয়াপটীর শম্ভুচরণ মল্লিক। খুব নামডাক তাঁর। সওদাগরী অফিসের মুৎসুদ্দী তিনি। প্রচুর অর্থ উপার্জন করে থাকেন। সৎকাজেও প্রকৃতি যেমন, তেমনি আছে নানান রকম সখ ও বিলাসিতা। ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া আসা করেন। কারণ হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনে গভীর সংশয়। এইরকম যখন তাঁর মনের অবস্থা, সেই সময়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা তাঁর কানে এলো। তখন থেকেই পরমহংসদেবকে নিয়ে নানা জায়গায় আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে—নানা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর বিচিত্র জীবন কথা। শম্ভুনাথও শুনলেন। দক্ষিণেশ্বরের কাছে আড়িয়াদহ গ্রাম। সেই-খানে গঙ্গার তীরে তাঁর প্রকাণ্ড এক বাগান বাড়ি।

একদিন শম্ভুনাথ বাগানবাড়ি চলেছেন। পথেই দক্ষিণেশ্বর। মনটা হঠাৎ যেন কেমন করে উঠলো তাঁর। কি যেন একটা দিব্য আকর্ষণ বোধ করলেন তিনি। গাড়ি থামল ফটকের সামনে। ভিতরে প্রবেশ করলেন তিনি। রামকৃষ্ণ তখন তাঁর ঘরটিতে বসে কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা বলছিলেন। তাঁর দিব্য আত্মপ্রকাশের পর থেকে যতদিন তিনি শরীর ধারণ করে পৃথিবীতে ছিলেন ততদিন অবিশ্রান্ত ভাবে বিতরণ করে গেছেন তাঁর কথামৃত একজনকে বলছেন, শাস্ত্রের দু'রকম মানে—এক শব্দার্থ, অন্যটা হলো মর্মার্থ। শেষেরটাই নিতে হয়—যেটা ভগবানের কথার সঙ্গে মিলে যায়।

আমি তো মায়ের মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছুই নিই না।

সুন্দর কথা। জ্ঞানের কথা। আর কত সরলভাবেই না বলছেন। শুনে চমৎকৃত হলেন শম্ভূচরণ। তখনই সেই যুগদেবতার পায়ের তলায় মাথা রেখে বলেন, দর্শন করতে এসেই শুনলাম সংশয় ভঞ্জনের পরম বাণী। আপশোষ হচ্ছে আরো আগে আসিনি কেন? আর ছাড়ান-ছোড়ান নেই—আজ থেকে তুমিই আমার গুরু। রামকৃষ্ণ তাঁকে সস্নেহে স্পর্শ করে কাছে বসালেন। মৃদু হেসে বললেন, কে কার গুরু! হয়ত তুমিই আমার গুরু হয়ে এসেছ। ক্রমে আলাপ জমে ওঠে। মল্লিকের যাওয়া-আসা বাড়তে থাকে। সেইদিন থেকে শম্ভূচরণই হলেন ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদদার তাঁর ভক্ত-ভাণ্ডারী। সারদা-দেবীকেও তিনি দেবীজ্ঞানে আরাধনা করতে থাকেন। এই দেব-দম্পতীই হয়ে উঠলেন তাঁর জীবনের একমাত্র উপাস্য।

কেশবচন্দ্র সেন তখন একজন বড় ব্রাহ্মনেতা।

ভক্ত এবং এবং ভাবুক। ঈশ্বর প্রেমিক। অসাধারণ বাগ্মী। দিব্যকান্তি প্রিয়দর্শন। দিনরাত তাঁর কণ্ঠে উঠছে প্রার্থনার অমৃতবাণী। সারা বাংলাদেশে, এমন কি বাংলার বাইরেও তাঁর নাম। পরমহংস-দেবের ইচ্ছা হলো এই মানুষটিকে একবার দেখবেন। ঈশ্বরানুরাগী লোকের খবর পেলেই তিনি নিজে থেকেই তাকে তাকে দেখতে যেতেন। কেশবচন্দ্র তখন বেলঘরিয়ার বাগানে অবস্থান করছিলেন। একদিন বিকেল তিনটের সময় হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে একখানা গাড়ি চড়ে রামকৃষ্ণ গেলেন কেশবচন্দ্রকে দেখতে।

গাড়ি এসে থামলো বাগানের সামনে। হৃদয় আগে ভেতরে গেলেন। কেশবসেনের কাছে এসে তিনি বললেন, আমার মামা হরিকথা শুনতে ভালবাসেন। মহাভাবে তাঁর সমাধি হয়। তিনি আপনার মুখে ঈশ্বরের কথা শুনতে এসেছেন।

আচ্ছা, তাঁকে ভেতরে আনুন।

রামকৃষ্ণ ছিলেন তখন ভাবের ঘোরে। হৃদয় তাঁকে ধরে ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে এলেন। রোগা শরীর, পরনে একখানা সামান্য লালপেড়ে ধুতি, কোঁচার খুঁটটি কাঁধে ফেলা। দেখলেই মনে হবে একজন সামান্য লোক-অতি সাধারণ মানুষ। ঠিক সেই ধারণাই হলো উপস্থিত সকলের।

—বাপু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন করে থাকো? সে কিরম দর্শন তা জানতে এসেছি।

এইকথা বলে, ভাবময় পরম পূরুষ নিজেই আরম্ভ করলেন ঈশ্বর-প্রসঙ্গ। বললেন নিজের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কথা। তারপর কিন্নর কণ্ঠে গাইলেন রামপ্রসাদের সেই বিখ্যাত গানটি—কে জানে কালী কেমন? সে-গান শুনলে পাষাণও গলে যায়। চারদিকের আবহাওয়ায় যেন ছোঁয়া লাগলো একটা বিশুদ্ধ ভাবের। প্রেমানন্দ বিকশিত মুখকান্তি, সেই প্রাণস্পর্শী মধুর কণ্ঠস্বর সকলের মন হরণ করলো হরণ করলো মন কেশবচন্দ্রের—তাঁরো প্রাণের মধ্যে জাগালো এক দিব্য অনুভূতি। গান গাইতে সমাধিস্থ হলেন রামকৃষ্ণ। দৃষ্টি তাঁর স্পন্দন হীন, স্থির-ঠিক যেন নিষ্কম্প প্রদীপশিখা। মুখখানি হাস্যময়। আধ-বোঁজা চোখ দুটি রক্তাক্ত।

কতক্ষণ পরে সমাধি ভাঙল। ঠাকুর হেসে উঠলেন। বললেন, ঈশ্বরের রূপ অনন্ত। তিনিই সাকার আবার তিনিই নিরাকার। তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। এ ছাড়া তাঁর আরো কত রূপ আছে, কে জানে? এইভাবে ভাবের ঘোরে ছোট ছোট কথায় বড় বড় তত্ত্বের সহজ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। উপস্থিত সকলেই স্থির হয়ে সেই অমৃতধারা পান করতে লাগলেন।

—তোমরা নাকি শক্তি মানো না? শক্তিকে না জানলে ব্রহ্মকে জানবার জো নেই। শক্তি আর ব্রহ্ম অভেদ। যেমন আগুন আর তার

দাহিকা শক্তি। একটি ভাবলে আর একটিকে ভাবতে হয়। মণি আর তার আভা।

কেশবচন্দ্র মুগ্ধ, মুখে তাঁর কথা নেই। ইনি তো দেখছি ঈশ্বর-জানা লোক, ভাবলেন তিনি। অবশেষে পরমহংসদেব হাসতে হাসতে কেশবকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমার ল্যাজ খসেছে। সেই অদ্ভুত কথা শুনে সবাই হাসতে থাকে। কেশবচন্দ্র সেটা লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা হাসছ কেন? এ কথার নিশ্চয়ই কোন মানে আছে বললেন কেশব।

রামকৃষ্ণ তাঁর কথার জের টেনে বলেন, দ্যাখো যতদিন ব্যাঙাচির ল্যাজ থাকে ততদিন সে জলেই থাকে। তারপর ল্যাজটা খসে গেলে, সে জলেও থাকতে পারে, ডাঙায়ও থাকতে পারে। তেমনি মানুষের অবিদ্যা ল্যাজ যতদিন থাকে ততদিন সে সংসাররূপ জলে থাকে। তা তোমার সে অবিদ্যারূপ ল্যাজ খসেছে।

এই সাক্ষাৎকারের পর থেকে কেশব গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন দক্ষিণেশ্বরের এই নিরক্ষর সাধকের প্রতি। তাঁর কথাগুলি কেশবের মনে যেন দাগ কাটল। তখন থেকে সমাজের কাজকর্মে অবসর পেলেই তিনি ছুটে আসতেন এখানে। তাঁর সঙ্গে আসেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ত্রৈলোক্য সান্যাল, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম ভক্তগণ। আসেন আরো অনেকেই। 'ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজে রামকৃষ্ণের কথা প্রথম প্রচার করলেন কেশবচন্দ্র। 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় বেরুলো তাঁর জীবনী। তখন থেকেই কলকাতার জনসমাজে রামকৃষ্ণের নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এতদিন যাঁরা দক্ষিণেশ্বরে আসতেন তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন বয়স্ক লোক; এবার শিক্ষিত তরুণদের যাওয়া-আসা আরম্ভ হয়। ১৮৭৫ সাল থেকেই শুরু হয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দিব্যপ্রকাশ। তাঁর এই দিব্যপ্রকাশের ফলে আমাদের নবজাগরণ একটা নতুন ভাবে, নতুন চেতনায় যেন মণ্ডিত হয়ে উঠলো।

এর ঠিক চার বছর পরের কথা। ফাল্গুন মাস; সেদিন ছিল

রামকৃষ্ণের জন্মতিথি। ঐদিন চন্দ্রাদেবীর মৃত্যু হলো। মায়ের যখন নাভিশ্বাস উঠলো তখন পরমহংসদেব ফুলচন্দন ও তুলসীপত্র দিয়ে তিনবার তাঁর পায়ে অঞ্জলি দিলেন—যেন সন্তানের শেষ প্রণাম জননীর প্রতি। ভাইপো রামলাল মুখাগ্নি করলেন। মায়ের আত্মার সদ্গতির জন্য তিনি ভবতারিনীর কাছে প্রার্থনা জানালেন।

একদিন পরমহংসদেব বসে আছেন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে। দরজা বন্ধ। এমন সময় কে যেন দরজায় করাঘাত করল। ঘরের মধ্যে ঠাকুর একলাই বসে ছিলেন। লোকে এখন তাঁকে 'ঠাকুর' বলেই সম্বোধন করে, তাঁর সকল ভক্তের কাছেই তিনি ঐ নামে অভিহিত হতেন। ঠাকুর নিজেই উঠে দরজা খুলে দিলেন। দেখলেন সামনে দুজন বাঙালী যুবক। আলাপ করে বুঝলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের লোক নয়। তখন তিনি ভাগ্নেকে ডেকে বলেন, ওরে হৃদু, এরা ব্রাহ্মসমাজের লোক নয়রে। তুই আয়, এদের মধ্যে একজন ডাক্তার। তোর হাতটা দেখানা একবার।

হৃদয় তখন কিছুদিন হয় জ্বরে ভুগছিল। যে দুটি যুবক এসেছিলেন এঁদের মধ্যে একজনের নাম রামচন্দ্র দত্ত, অন্যটির নাম মনোমোহন মিত্র। থাকেন কলকাতার সিমুলিয়াতে। এই রামদত্তই স্বামী-বিবেকানন্দের নিকট সম্পর্কের কাকা। দুজনেই চাকরি করেন। রবিবার ছাড়া এঁদের অবসর নেই। হৃদয় এলে পরে ডাক্তার মনোমোহন মিত্র তাকে পরীক্ষা করে বলেন জ্বর নেই। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় তাঁরা ফিরে যাবেন বলে উঠলেন। ঠাকুর বললেন, একটু দাঁড়াও, মায়ের প্রসাদ খেয়ে যাও। তাঁরা প্রসাদ গ্রহণ করে বিদায় নিলেন। মন্দিরের ফটক পর্য্যন্ত সঙ্গে এলেন ঠাকুর, বললেন, আবার এসো, আবার এসো।

এখন থেকে প্রতি শনি ও রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে বহু লোকের ভীড় হতে থাকে। সকলেই আসেন রামকৃষ্ণকে দেখতে, তাঁর শ্রীমুখের

অমিয় কথা শুনতে। এতকাল যা ছিল শুধুই কালীমন্দির, সেই স্থানটি এখন সবসময় ঈশ্বরের কথায় ও কীর্তনে যেন গম্ গম্ করছে। রামচন্দ্র ও মনোমোহনের সঙ্গে একদিন এলেন সুরেন মিত্র। ইনিও সিমুলিয়াতে থাকতেন। এক ইংরেজ সওদাগরি অফিসে মুচ্ছুদির কাজ করতেন। এসেছিলেন তিনি নিছক একটা কৌতূহল নিয়ে, ফিরে গেলেন গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে। এই সুরেন মিত্র পরে ঠাকুরের গৃহভক্তদের মধ্যে একজন হয়েছিলেন।

আর একদিনের কথা। পরমহংসদেব বারান্দায় পায়চারী করছেন। এমন সময় সেখানে একটি বিহারী ছেলে এসে উপস্থিত হলো। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো তাঁকে।

—কী নাম?

—লাটু।

—বাড়ি কোথায়?

—ছাপরা জেলায়।

—এখানে কোথায় থাকিস?

—সিমুলিয়ায় রামদত্ত বাবুর বাড়িতে।

—রোদে তোর মুখখানা পুড়ে গেছে দেখছি; আয় ভেতরে আয়।

লাটু ভেতরে এলেন। ঠাকুর তার জলযোগের ব্যবস্থা করলেন। এতকাল ধরে ঠিক যে রকম ভক্তদের জন্য তিনি প্রতীক্ষা করেছিলেন। তাঁদেরই একজন এই বালক। উত্তরকালে ইনিই রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে স্বামী অদ্ভুতানন্দ বা লাটু মহারাজ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ইনিই ছিলেন রামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্য ও সন্তান। কিন্তু আর সব কোথায়? কোথায় ত্যাগ ও বৈরাগ্য পরিশুদ্ধ আর সব ছেলেরা? কবে তারা আসবে? তারা না এলে তার প্রকাশ যে সম্পূর্ণ হবে না। তারাই যে তাঁর লীলা সহচর।

শাশুড়ী মারা যাওয়ার খবর পাওয়ার পর থেকেই সারদাদেবী

দক্ষিণেশ্বরে আমার জন্য খুব ব্যস্ত হলেন। সেই ষোড়শী পূজার পর তিনি কামারপুকুর চলে গিয়েছিলেন। ব্যস্ত হওয়ার আরো একটা কারণ ছিল। লোক মুখে খবর পেয়েছিলেন যে স্বামীর শরীর সুস্থ নয়, পেটের অসুখ। এই অসুখ হওয়ার একটা কারণ ছিল। একবার মথুরের স্ত্রী জগদম্বা দাসীর খুব কঠিন অসুখ করেছিল ; বাঁচবার আশাই ছিল না। তখন মথুর এসে ঠাকুরকে বলেন, বাবা, জগদম্বাকে সারিয়ে দাও, নইলে আমি বাঁচবনা। রামকৃষ্ণ মথুরের এই অনুরোধ রেখে-ছিলেন। জগদম্বার অসুখটা নিজের শরীরে নিয়েছিলেন। এরফলেই তাঁর হলো আমাশা রোগ। এমন কঠিন আমাশা যে হাতের জল শুকোতনা।

নিজে অসুস্থ, পরিচর্যার দরকার, তবু রামকৃষ্ণ একটিবারের জন্য সারদাদেবীকে কাছে আনার কথা চিন্তা করেননি। তিনি নিজে থেকেই এলেন একদিন দক্ষিণেশ্বরে লক্ষ্মীকে সঙ্গে করে। লক্ষ্মী ঠাকুরের ভাইঝি উঠলেন নহবতের ঘরে। তারা এসেছে বলে রামকৃষ্ণ খুব খুশি হলেন। স্বামীর শীর্ণ শরীর দেখে শংকিত হন সারদাদেবী। জিজ্ঞাসা করেন, একী, এত রোগা হয়ে গিয়েছ তুমি ? সরল স্বভাব স্বামী উত্তর দিলেন—জগদম্বার রোগ আমার শরীরে। পেটের অসুখ, জ্যান্ত মাছের ঝোল আর সরুচালের ভাত, এছাড়া অন্য কিছু খেতে নিষেধ। তখন থেকে স্বামীর সেবায় প্রাণ ঢেলে দিলেন সারদাদেবী। এমন নিঃশব্দে রইলেন তিনি নহবতের ঘরে কেউ জানতেই পারলনা যে তিনি সেখানে বাস করছেন।

দিনে দিনে শতদলের মতো বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে রামকৃষ্ণ মহিমা তার সকল সৌরভ নিয়ে। দলে দলে ছুটে আসে দক্ষিণেশ্বরে যত জিজ্ঞাসু ও ধর্মপিপাসুর দল। শতাব্দীর পটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো এক দেবমানবের দিব্য প্রকাশ। পৃথিবী যেন এই প্রকাশের জন্যেই অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ধর্মের জগতে দেখা দিলো এক নতুন আলো, নতুন চেতনা। বহু সিদ্ধ-সাধকের যুগ-

যুগান্তের সাধনা-পূত বাংলার শ্যামল মাটিতে দেখা দিলো এক অলৌকিক সাধনার বিচিত্র বিভা।

সেই নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ আজ বসেছেন জগৎ গুরুর আসনে। কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে গদাধর আজ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস। একদিন কলুটোলার হরিসভা উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন তিনি। সুবিস্তীর্ণ সুসজ্জিত সভামণ্ডপ। বিরাট আসর। সেখানে বসে আছেন শহরের সকল শ্রেণীর ধনী, সুধী ও ভক্তগণ। মণ্ডপের সামনে একটা উঁচু বেদীর ওপর শোভা পাচ্ছে সুগন্ধি পুষ্পস্তবকে সজ্জিত একটি আসন। প্রেমাবতার মহাপ্রভুর আসন। ভক্তরা কল্পনায় দেখেন মহাপ্রভু স্বয়ং যেন সেই পবিত্র আসনে বসে হরিকথা শুনছেন।

রামকৃষ্ণ এলেন সভামণ্ডপে। আসামাত্রই তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। ভাবের আবেগে বেদীর দিকে চলেছেন ভাবময় পুরুষ। সোজা গিয়ে তিনি বসে পড়লেন বেদীর ওপর স্থাপিত মহাপ্রভুর জন্য নির্দ্দিষ্ট সেই আসনে। বসবার সঙ্গে-সঙ্গেই ভাব সমাধি। উপস্থিত সকলেই সেই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ, অভিভূত। কারো মুখে কিন্তু একটি কথা নেই—নেই প্রতিবাদের বা তিরস্কারের রূঢ় বাণী। শুধু গোঁড়া বৈষ্ণব যে কয়জন এসেছিলেন তাঁরা একটু সোরগোল তুলবার চেষ্টা করলেন।

কে এই উন্মাদ যে সভায় এসে, বলা নেই কওয়া নেই বসে পড়ল শ্রীচৈতন্যাসনে। সকলের মনে এই নীরব প্রশ্ন। কিন্তু কী আশ্চর্য, উনি উঠেই ভাব-সমাধিতে ডুবে আছেন। কে একজন বললেন, হরি কীর্তন আরম্ভ করে দিন। তাই হলো। কীর্তন আরম্ভ হতেই রামকৃষ্ণের সমাধিভঙ্গ হয়—তিনি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। পরক্ষণেই সেই পবিত্র আসনের ওপর দাঁড়িয়ে ভাবাবেগে তিনি নাচতে আরম্ভ করলেন। সে অপূর্ব নৃত্যের ভঙ্গি দেখে ভক্তদের চোখে পলক পড়ে না। স্বয়ং মহাপ্রভুই বুঝি এর দেহে

আজ আবির্ভূত হয়ে এই ভাব-নৃত্যে মত্ত হয়েছেন। বিরক্তি রূপান্তরিত হয় শ্রদ্ধায়। নির্বাক বিস্ময়ে সবাই তাকিয়ে আছে সেই আশ্চর্য মানুষটির দিকে। ভাবের বন্যায় হরিসভা যেন টল মল।

সামধ্যায়ী বলে একজন ছিলেন হরিসভার আচার্য। তিনি আরম্ভ করলেন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ। বললেন, ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেমভক্তি দিয়ে তাঁকে সরস করতে হবে।

তুমি যে অবাক করে দিলে গো। বলেন রামকৃষ্ণ তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ সরল ভঙ্গিতে।

হ্যাঁ, ঈশ্বর নীরসই তো।

না কখখোনো না। তিনি রস স্বরূপ। তুমি অনুভবই করনি ঈশ্বর কি জিনিস।

হরিসভায় আচার্যের মুখে আর কথা নেই।

দিন যায়।

দিব্যভাবের পূর্ণ প্রকাশ একে একে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে ঠাকুরের কিঞ্চিত সন্তানদের। বারো বছরের কঠোর আর অলৌকিক সাধনা এবং সিদ্ধি শতাব্দীর পটে নিঃশব্দে লিখে চলে এক নতুন ইতিহাস। সর্বসাধনায় সিদ্ধ রামকৃষ্ণ যখন তাঁর ভাবী ভক্তদের জন্য দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করছিলেন, তখন একে একে আসতে লাগলেন সংসারের আকর্ষণ ছিন্ন করে সন্ন্যাসী সৈনিকের দল। এলেন বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, সারদানন্দ, শিবানন্দ, অভেদানন্দ, প্রভৃতি তাঁর চিহ্নিত মানস-পুত্রগণ। দক্ষিণেশ্বরের তপোবনে শুরু হয় আত্মনিবেদনের পালা। এইসব লীলা-সহচরগণ যখন একে-একে তাঁর কাছে এসে জড়ো হলেন, তখন রামকৃষ্ণের কী আনন্দ। হৃদয়কে ডেকে বলেন, ওরে হৃদু, আমার কথা কি মিথ্যে হয় রে।

বিবেকানন্দের কথাটাই বলি।

একদিন পরমহংসদেব কলকাতায় এসেছেন সুরেন মিত্রের বাড়িতে। দিব্য প্রকাশ হওয়ার পর থেকে তিনি মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন তাঁর ভক্তদের অনুরোধে। তিনি এসেছেন শুনে সেখানে এলেন রামদত্ত, মনোমোহন ডাক্তার ও তাঁর ভগ্নিপতি রাখাল ঘোষ। এই রাখালই পরে হয়ে ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ—রামকৃষ্ণ সংঘে তিনি রাজামহারাজ বলে অভিহিত হতেন আর তাঁর স্থান ছিল স্বামী বিবেকানন্দের পরেই। ঠাকুর গান শুনতে চাইলেন। কে গান গাইবে? রাম দত্ত তখন ডেকে নিয়ে এলেন নরেনকে। নরেন্দ্রনাথ দত্ত—এ্যাটর্ণী বিশ্বনাথ দত্তের বড় ছেলে। কলেজে পড়েন। ব্রাহ্ম সমাজের খাতায় তিনি নাম-লেখানো সভ্য। সেখানে গান করেন। কণ্ঠস্বর যেমন মিষ্টি, তেমনি গুরুগম্ভীর।

নরেন্দ্রনাথ এলেন। উনিশ বছরের যুবক। সুন্দর টানা টানা রক্তাভ চোখ দুটি। চোখ থেকে ফুটে বেরুচ্ছে প্রতিভার আলো। নরেনকে দেখা মাত্র ঠাকুর মনে মনে বলেন, আহা! কতদিনের পরিচিত ও! যেন জন্ম-জন্মান্তরের আত্মীয়। নরেনের গান শুনে ঠাকুরের ভাব সমাধি হলো। গান গাওয়া শেষ হলে তিনি ভাবাবেগে তার দুটি হাত জড়িয়ে ধরলেন। শান্তস্বরে বললেন, সামনের রবিবারে একবার দক্ষিণেশ্বর আসিস।

নরেন এলেন দক্ষিণেশ্বরে। সঙ্গে কয়েক জন বন্ধু। ঠাকুর তাকে গান গাইতে বললেন। নরেন গান ধরলেন ঃ

মন চলো নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে॥
বিষয় পঞ্চম আর ভূতগণ
সব তোর পর, কেহ নয় আপন,
পরপ্রেমে কেন হইয়ে মগন,
ভুলিছ আপন জনে।

গান শুনে ঠাকুর মুগ্ধ হলেন। ভাবাবেগে বললেন, গানা, আর

একখানা গা। তারপর গান শেষ হলে নরেনের হাতদুটি ধরে উত্তরের বারান্দায় এলেন ঠাকুর। বাইরে থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল ঝরতে থাকে। নরেনের হাত দুটি ধরে পরম স্নেহে বলেন, এতদিন বাদে এলি? আমি যে তোর জন্যে প্রতীক্ষা করে রয়েছি। তারপরেই ভাবাবিষ্ট হয়ে বলেন, জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ। জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে আবার শরীর ধারণ করেছ।

এ ঘটনা ১৮৮৩ সালের।

এরপর যে তিন বছর রামকৃষ্ণ এই সংসারে ছিলেন সেই সময়ের মধ্যে নরেন্দ্রনাথকে তিনি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মন্ত্র আর শিবজ্ঞান জীব পূজার আদর্শ—এই দুটি জিনিস দান করে তাঁর ভাবী জীবনের সুপষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দিন এসেই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন আচ্ছা মশাই ঈশ্বর কি আছেন?

—হ্যাঁ আছেন।

—তাঁকে দেখা যায়?

—হ্যাঁ। তোকে যেমন দেখছি ঠিক সেইভাবে ঈশ্বরকেও দেখা যায়। আমি দেখেছি।

এমনি প্রত্যয়ের ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন তিনি যে নরেন শুনে বিস্মিত হলেন। এবার ফিরবার পালা। —এসেছিস, মায়ের প্রসাদ একটু খেয়ে যা। তারপর বিদায়ের কালে বলেন, আবার আসিস। আসবি তো? কিন্তু এবার একা আসবি। নরেন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে এলেন।

আট

তখনকার কলকাতায় এমন কোন শিক্ষিত ও ধর্মপিপাসু ব্যক্তি ছিলেন না যিনি রামকৃষ্ণকে দেখতে দক্ষিণেশ্বরে না এসেছেন। যাঁরা আসেন নি—যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ; বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুর নিজে তাঁদের কাছে গিয়েছেন। এই ভাবেই একদিন দক্ষিণেশ্বরে এলেন বলরাম বসু। ঠাকুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৃহীভক্ত। বাগবাজারে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি। জমিদার মানুষ। এই বলরাম বসুকেই তিনি বলেছিলেন, ওগো মা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তুমি যে আমার আপনার লোক। তুমি যে মায়ের একজন রসদদার। সত্যিই তাই। মথুরাবাবু মারা যাওয়ার পর পাথুরিয়া ঘাটার শম্ভূ মল্লিক আর বাগবাজারের বলরাম বসু এই দুই ভক্তই ছিলেন ঠাকুরের রসদদার। বলরামের প্রাসাদতুল্য বাড়ি রামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে পরিণত হয়েছিল বলরাম মন্দিরে।

প্রথম যেদিন বিনা পরিচয়ে বলরাম বসু দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন, সেদিন তিনি ঠাকুরকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মশাই, ভগবান কি সত্যি আছেন ?

—হ্যা ভগবান আছেন বৈ কি।

—তাঁর দর্শন পাওয়া যায় কি ?

—তাঁকে আপনার ভেবে ডাকলে তিনি দেখা দেন। এক ডাকে দেখা না পেলে ভাবতে নেই যে তিনি নেই। দিনের বেলায় নক্ষত্র দেখা যায়না, তা বলে কি বলবে আকাশে নক্ষত্র নেই।

—তবে তাঁকে এত ডাকি, কিন্তু তাঁর দর্শন পাইনে কেন ?

—নিজের ছেলে মেয়ের ওপর যেমন টান আছে, ঠিক তেমনি আপন ভেবে ডাকো কি ?

—আজ্ঞে না, সে রকম ভাবে ডাকিনি।

—আপনার হতেও আপনার ভেবে তাঁকে ডাকো। নিশ্চয় বলছি তিনি ভক্তবৎসল, দেখা না দিয়ে থাকতে পারবেন না তিনি। আমি তো ডেকে ডেকেই মায়ের দেখা পেলাম, মায়ের সঙ্গে কথা বললাম।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এ আমি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, শাস্ত্র পড়ে বা লোকের মুখে শুনেও নয়। মানুষ তাঁকে ডাকার আগে তিনি এগিয়ে আসেন।

—বলেন কি।

—হ্যা, ঠিক বলছি। মানুষ যদি এক পা এগোয়, তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন। তাঁর চেয়ে আপনার জন এ-সংসারে আর কেউ নেই।

প্রথম সাক্ষাতেই পরমহংসদেবের মুখে এইসব কথা শুনে বলরাম বসুর মন শীতল হয়েছিল। প্রসন্ন মনে ফিরে এলেন। পরের দিন তিনি নিজে বাজারে জিনিসপত্র কিনলেন এবং গাড়ি করে সেসব নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। রামকৃষ্ণ খুব খুশি। হৃদয়কে ডেকে বলেন, এঁর আনা প্রত্যেকটি জিনিস বড় পবিত্র। ইনি মায়ের আপনজন। আজ ঐ দিয়ে ভোগ রাঁধতে দিস। বেশ ভাল করে রাখিস।

সেই থেকে পরমহংসদেবকে দর্শন করতে, তাঁর শ্রী মুখের অমিয় বচনসুধা পান করতে বলরাম বাবু প্রত্যহ সকালে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। আর সেই অবধি প্রত্যেক বছর রথের সময় তিনি ঠাকুরকে তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে নিয়ে যেতেন। সেখানে যে ঠাকুরের কত বার শুভাগমন হয়েছে তা বলা যায় না। কত লোকে যে বলরাম-মন্দিরে তাঁকে দর্শন করে কৃতার্থ হয়েছে, কে তার ইয়ত্তা করবে? ঠাকুর তাই বলতেন, বলরামের বাড়ি মা কালীর দ্বিতীয় কেল্লা; প্রথম কেল্লা দক্ষিণেশ্বর।

লোকের মুখে শুনে একদিন বিখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশ ঘোষ এলেন ঠাকুরকে দেখতে। তিনিও থাকতেন বাগবাজারে। 'পরমহংস' কথাটা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন গিরীশ। ঠাকুর কথাটার মানে এমন সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে তা শুনে তিনি অবাক হলেন। কত সহজভাবে, সুন্দর উপমা দিয়ে ইনি তত্বের কথা বলেন, মনে মনে ভাবেন গিরীশ।

—পরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেবে।

—আপনি আশীর্বাদ করুন। কিন্তু আমি কে? আমার কি ক্ষমতা আছে?

তুমি মা'র নামে বিশ্বাস করো। তাহলে সব হয়ে যাবে।

—কিন্তু আমি যে পাপী। আমার কথা কি মা শুনবেন?

—নিশ্চয়ই শুনবেন। যে সব সময় পাপ পাপ করে সে শালা পাপী হয়ে যায়।

—আমি যেখানে বসতাম সে মাটিও যে অশুদ্ধ।

—সে কি! হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু করে আলো হয়, না একেবারে দপ করে আলো হয়?

—আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।

—আমি আশীর্বাদ করবার কে? যা করেন তা সবই মা করছেন। আমি যে তুমি আর ঐ তুমিই তিনি—পরম ব্রহ্মময়ী জগজ্জননী। তোমার যদি আন্তরিকতা হয়—আমি কি বলবো! আমি খাই দাই মায়ের নাম করি। যদি কেউ কিছু করে তো তিনিই করবেন।

—আমার আন্তরিকতা নেই, ঐটুকু যদি দয়া করে দেন।

—আমি কে? নারদ-শুকদেব হতেন তো হতো।

—নারদকে তো পাচ্ছি না। আমরা তোমাকে পেয়েছি। তুমি কৃপা করো।

—বিশ্বাস চাই। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। তিনি আছেন—এই জ্ঞান থাকা চাই।

এক আধবার নয়, বহুবার এসেছেন গিরীশচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে। তাঁর কৃপা লাভ করে নোটো গিরীশ ভক্ত-ভৈরবে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামনি তখন হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রচার করতেন। সুপণ্ডিত দার্শনিক। প্রখর যুক্তিবাদী। ঠাকুর দেবতা কিংবা অলৌকিক এসবে বিশ্বাস নেই কিছুমাত্র। সেই শশধর পণ্ডিত একদিন এলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তখন অর্ধবাহ্য দশায় ছিলেন। পণ্ডিত ঘরের মধ্যে ঢুকতেই, ঠাকুর সেই অবস্থায় তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, ও গো, তুমি পণ্ডিত। তুমি কিছু বলো, আমি শুনি।

—মশাই দর্শন শাস্ত্র পড়ে পড়ে আমার হৃদয়টা যেন শুকিয়ে গেছে। তাই আপনার কাছে এসেছি ভক্তিরস পাবো বলে। বরং আমি শুনি, আপনি কিছু বলুন।

—আমি আর কি বলবো, বাবু! সচ্চিদানন্দ যে কি তা কেউ বলতে পারে না। তাই তিনি প্রথম হলেন অর্ধনারীশ্বর।

কেন ?—না, দেখাবেন বলে যে পুরুষ প্রকৃতি দুই-ই তিনি। তারপর তা থেকে আরো একধাপ নেমে, আলাদা আলাদা পুরুষ ও আলাদা আলাদা প্রকৃতি হলেন। সচ্চিদানন্দে যতদিন মন না লীন হয় ততদিন তাঁকে ভাবা ও সংসারের কাজ করা দুই-ই থাকে। তারপর তাতে মন লীন হলে আর কোনো কাজ করবার দরকার হয় না।

এই কথা বলতে বলতে ভাবাবেশে অভিভূত হয়ে পড়লেন ঠাকুর নির্বাক, নিস্পন্দ। কিছুক্ষণ ভাবের ঘোরে কেটে যায়। তখন পণ্ডিতকে সম্বোধন করে বলেন, তোমাকে দেখলুম। তুমি বেশ লোক। বাড়ির গিন্নী যেমন রেঁধেবেড়ে সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে গামছাখানা কাঁধে ফেলে পুকুরঘাটে গা-ধুতে কাপড় কাচতে যায় হেঁশেলের ঘরে ফেরে না। তেমনি তুমিও সকলকে তাঁর কথা বলে-কয়ে যাবে। আর ফিরবেনা।

ঠাকুরের কথা শুনবার পর শশধর পণ্ডিত বারংবার তাঁর চরণ ধূলি মাথায় নিলেন। পরে সাশ্রুনয়নে বললেন, দর্শন চর্চা করে করে হৃদয়টা শুকিয়ে গেছে ; আমায় একবিন্দু ভক্তি দিন। তখন রামকৃষ্ণ পণ্ডিতের বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। কেঁদে ফেললেন তিনি ; বললেন, এতদিনে শান্তি পেলাম। আপনার স্পর্শলাভ করে ধন্য হলাম।

ছ্যাখো, শুধু এক ঘেয়ে। কেবল বিচার করছে ; এ নয়, এ নয়, এসব স্বপ্নবৎ। আমি কিন্তু দু'হাত ছেড়ে দিয়েছি ; তাই সব নিই। আমি মা'র কাছে গিয়ে কাঁদতুম আর বলতুম মা, বিচার বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক। মা'র কৃপায় বিচার বুদ্ধি চলে গেল। ভক্তের প্রার্থনা মা শুনলেন। ছ্যাখো ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ—এসবই এক-একটা পথ। যে পথ দিয়েই যাও তাঁকে পাবে। ভক্তির পথ সহজ পথ। জ্ঞান বিচারের পথ কঠিন পথ।

রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে শান্ত হলেন শশধর পণ্ডিত। দূর হয় অন্তরের অতৃপ্তি। ভাবেরও পরিবর্তন ঘটলো। এরপর তিনি প্রচার

কার্য ত্যাগ করে কামাখ্যাপীঠে চলে গিয়ে বাকী জীবনটা তপস্যা করে কাটিয়ে দেন।

একদিন লক্ষ্মীকান্ত মাড়োয়ারী এলো দক্ষিণেশ্বরে। তার অগাধ টাকা, বিস্তর বিষয় সম্পত্তি। ঠাকুরের ঘরে এসে তাঁর বিছানার দিকে তাকালো। এত বড়ো সাধু, এত নাম ডাক যাঁর, তাঁর এই সামান্য বিছানা, তাও আবার ময়লা! লক্ষ্মীকান্ত মাড়োয়ারী বললো, আমি আপনার নামে এই দশ হাজার টাকা লিখে দিচ্ছি। তার সুদ থেকে আপনার ভরণ পোষণ চলবে।

টাকার কথা শুনে চমকে উঠলেন যুগদেবতা। তিনি একটা পয়সা স্পর্শ করেন না, যিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী তিনি নেবেন দশ হাজার টাকা! সোজা বললেন, না। দশহাজার টাকা তো তুচ্ছ। সেজবাবু আমাকে লাখ টাকার একটা তালুক লিখে দিতে চেয়েছিলেন।

মনঃক্ষুণ্ণ হয় মাড়োয়ারী। ঠাকুরের ঘর থেকে চলে আসার সময় দেখা হয়ে যায় হৃদয়ের সঙ্গে। মাড়োয়ারী হৃদয়কে সঙ্গে করে ঠাকুরের কাছে আবার এলো। হৃদয়কে দেখিয়ে বললো ঠাকুরকে। তবে এঁর কাছে দিয়ে যাই। আপনার সেবায় লাগবে। ঠাকুর এবারেও প্রত্যাখান করলেন। বললেন, না বাপু। তুমি টাকা, নিয়ে যাও। ও আমার দরকার নেই। অনেক ঝামেলা, মাকেও যাব ভুলে।

মাড়োয়ারীকে নিয়ে হৃদয় তখন এলো নহবতে সারদাদেবীর কাছে। এতগুলো টাকা, সে সহজে ছাড়বার পাত্র নয়।—মামী, শুনছো ইনি মামাকে দশহাজার টাকা দেবেন বলে সাধছেন। মামাতো হাঁকিয়ে দিয়েছেন। আমি বলি কি টাকাটা তুমি নাও। তখন সতেজকণ্ঠে সারদা দেবী বলে উঠলেন, হৃদয়, যে টাকা উনি নিতে পারেন নি, সে টাকা আমি কেমন করে নেব?

কথাটা ঠাকুরের কানে গেল। মহাখুশি তিনি। উৎফুল্ল হৃদয়ে

বলেন, আমি জানি, ও টাকা নেবে না! ও বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে। আমি যখন সেজবাবুর দেওয়া তালুক নিতে রাজী হলাম না, তখন তিনি নহবতে গিয়ে আমার মাকে সেধেছিলেন। মা তাঁকে ঠিক অমনি ভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মাড়োয়ারী বিষন্ন মনে ফিরে আসে দক্ষিণেশ্বর থেকে।

শুধু যে পুরুষ ভক্তগণ তাঁর কৃপা পেয়েছিলেন তা নয়। ভক্তিমতী অনেক সম্ভ্রান্ত নারীও তাঁকে দর্শন করে কৃতার্থ হয়েছিলেন। ঠাকুর যখনই বলরাম মন্দিরে আসতেন তখন সেখানে অন্দরমহলে স্ত্রীভক্তরা এসে বসতেন। তাঁদের মধ্যে গোপালের মা (শ্রীমতী অঘোরমনি দেবী), যোগীন-মা (শ্রীমতী যোগীন্দ্র মোহিনী বিশ্বাস), গোলাপ মা (শ্রীমতী গোলাপ সুন্দরী দেবী) , মহাতপস্বিনী গৌরী মা, লক্ষ্মীদিদি (শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী) ছিলেন প্রধান। এঁরা সকলেই ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতা বলে মনে জানতেন। সকলেরই ঠাকুরের ওপর একরকম বিশ্বাস। তিনি যুগদেবতা।

এঁদের মধ্যে পরম ভাগ্যবতী ছিলেন অঘোরমণি দেবী। তিনি ছিলেন কামারহাটির এক বামুনের মেয়ে। সবাই তাঁকে ডাকতো গোপালের মা বলে। তাঁর ছিল গোপালভাব ; কত কি দর্শন হয়েছে। গোপাল তাঁর কাছে হাত পেতে খেতে চায়। একদিন ভাবে প্রেমে উন্মাদ হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন তিনি। ঠাকুর তাঁকে খাওয়ালেন যত্ন করে। তখন তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন। ঠাকুর থাকতে বললেন, কিন্তু তিনি থাকলেন না। যাওয়ার সময় ও সেই রকম উন্মাদ অবস্থা গায়ের কাপড় মাটীতে লুটিয়ে যাচ্ছে, হুঁশ নেই। তিনি আবার কাপড় তুলে দিয়ে বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

একদিন। ঠাকুর রয়েছেন বলরাম বসুর বাড়িতে। গোপালের মার কথা উঠলো। ঠাকুর বললেন, ওর খুব ভক্তি বিশ্বাস। তাকে এখানে আনতে পাঠাও না একবার। গাড়ি গেল কামারহাটি

গোপালের মাকে আনতে। তখন দুপুরবেলা। ভক্তগণ প্রসাদ পেলেন। একটু বিশ্রামের পর ঠাকুর বাইরে হল ঘরে বসে ভক্তদের সঙ্গে নানা ঈশ্বরীয় কথা বলছেন। বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যা হয় হয়। এমন সময় তাঁর ভাবাবেশ হলো। সকলেই সবিস্ময়ে দেখলেন ঠাকুরের বাল গোপাল মূর্তি—দুই হাটু ও এক হাত মাটীতে হামা দেওয়ার ভাবে রেখে আর অন্য হাতটি তুলে উর্দ্ধমুখে যেন কার মুখের দিকে আহ্লাদে আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে রয়েছেন ও কি চাইছেন যেন। ভাবাবেশে ঠাকুরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির ঠিক সেই রকম সংস্থান হয়ে গেল। আধ বোঁজা চোখে তাকিয়ে আছেন।

একটু পরেই গোপালের মাকে নিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো বলরাম বাবুর বাড়ির দরজায়। গোপালের মা ওপরে এসে ঠাকুরকে আপনার ইস্টরূপে দর্শন করলেন। উপস্থিত সকলের মনে তখন এই ধারনা জন্মালো যে এই ভক্তিমতী নারীর ভক্তির জোরেই ঠাকুর সাক্ষাৎ বাল গোপাল রূপ ধারণ করলেন। লীলাময় পরম পুরুষ তাঁর ভক্তদের অনুগ্রহ করতেই সেদিন বলরাম মন্দিরে তাঁর এই লীলা প্রকাশ করে ভক্তির মহিমা সকলকে বুঝিয়ে দিলেন।

একদিন। হরিকথা প্রসঙ্গের শেষে সকলে চলে গিয়েছে। ঠাকুর দেখতে পেলেন একটি যুবক তখনো পর্যন্ত অপেক্ষা করছে। আপাদমস্তক যুবকটিকে নিরীক্ষণ করলেন তিনি। বুঝলেন এতো তাঁরই চিহ্নিত একটি সন্তান। তবু তাকে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি কেন এসেছ? কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হয়ে যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—আপনাকে দেখতে আপনার কথা শুনতে।

—নাম কি?

—নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ।

—বাড়ি কোথায়?

—চব্বিশ পরগনার রাজারহাট বিষ্ণুপুরে।

ইনিই পরে ঠাকুরের অন্যতম মানস সন্তান স্বামী নিরঞ্জনানন্দ হিসেবে রামকৃষ্ণ সংঘে খ্যাত হয়েছিলেন। এঁকেই ঠাকুর বলেছিলেন, ভগবানের কথা ভাবতে ভাবতে লোকে ভগবান হয়ে যেতে পারে। সেই কথা শুনে নিত্যনিরঞ্জন বলেছিলেন, যদি হতেই হয় তবে ভগবান হওয়াই ভালো।

ঠিক এমনি ভাবেই একদিন আহিরীটোলা থেকে পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন কিশোর কালীপ্রসাদ। এসে দেখেন ঠাকুর নেই, তিনি কলকাতায় গেছেন। কাউকে না বলেই এসেছিলেন। প্রসাদ পেয়ে ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধ্যার অনেক পরে 'জয় কালী' হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের ফটক থেকে তাঁর ঘরে এলেন। একটু বিশ্রাম করলেন। তারপর হৃদয়ের কাছে শুনলেন একটি ছেলে দুপুর থেকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। ভেতরে ডাকলেন তাকে। অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং তারপরে তার এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ছেলেটি বলে, আমি আপনার সেবক। আপনি কৃপা করুন আমাকে। ছেলেটির চোখ মুখ্ হাত-পা সব দেখলেন খুঁটিয়ে। সর্বাঙ্গে সুলক্ষণ—সন্ন্যাসীর লক্ষণ। হ্যাঁ, এতো তাঁরই আর একটি সন্তান। সেই রাত্রেই তার দীক্ষা হয়ে গেল। ইনিই পরে কালী তপসী বা স্বামী অভেদানন্দ নামে বিপুল রামকৃষ্ণ সংঘে বিখ্যাত হয়েছিল। ইনিই স্বামী বিবেকানন্দের পরে আমেরিকাতে এক নাগাড়ে পঁচিশ বছর বেদান্ত প্রচার করেছিলেন।

দিন যায়। শহর কলকাতা তখন হয়ে উঠেছে দক্ষিণেশ্বরমুখী। সকলেই দৃষ্টি তখন ঐ দেবমানবের দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। তখন থেকেই প্রতি শনিবার কলকাতার সকল ভক্তদের বাড়িতে উৎসব আরম্ভ হতে থাকে। পরমহংসদেব এলে তাঁর সঙ্গে বহুলোক এসে সমবেত

হতেন। রাম দত্ত, সুরেন মিত্র, বলরাম বসু—কোন না কোন ভক্তের বাড়িতে তাঁর শুভাগমন উপলক্ষে কীর্তন ভজন হতো। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গই সেখানে স্থান পেতনা। পরে উপস্থিত সকলকে পরিতোষ করে আহার করানো হতো। এইভাবে সেদিন হিন্দু সমাজের বুকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে এক বিরাট রামকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ।

পরমহংসদেব এইসময়ে তাঁর মানস সন্তানদের নিজের কাছে রেখে সাধন ভজন ও তপস্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে ভবিষ্যতের রামকৃষ্ণ মিশন। নিজের ভাবে গড়ে তুলতে লাগলেন তাঁর সৈনিক সন্ন্যাসীদের জীবন। তাদের বলতেন, আগে ঈশ্বরলাভ, তারপর অন্য কাজ। এই সন্তানদের সামনেই একদিন নরেন্দ্র সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন—নরেন যেন সহস্রদল কমল। ওই তোদের নেতা হবে, ঐ তোদের চালাবে।

এই নরেন্দ্রনাথকে একদিন তিনি যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তেমন শিক্ষা বুঝি তিনি জীবনে কোথাও পান নি। ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথার মধ্যে কী গভীর অর্থ থাকতে পারে তা তিনি যেমনটি বুঝতেন, এমনটি আর কেউ বুঝতে পারতেন না। এরই একটা ঘটনা উল্লেখ করছি এখানে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরের তক্তপোষের ওপর বসে আছেন ঠাকুর। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন অন্তরঙ্গ ভক্তের দল। নরেন্দ্রও সেখানে উপস্থিত। ঈশ্বরীয় কথার ফাঁকে চলছে নির্দোষ রঙ্গরসের কথা। কথাপ্রসঙ্গে উঠলো বৈষ্ণবধর্মের কথা। এই ধর্মের সার মর্ম সরল ভাষায় সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে, ঠাকুর বললেন—নামে রুচি, জীবে দয়া—

মুখের কথা শেষ হলো না তাঁর। 'জীবে দয়া' পর্যন্ত বলেই তিনি সহসা সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। কতকক্ষণ পরে অর্ধবাহ্য দশায় উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন—জীবে দয়া, জীবে দয়া? দূর শালা!

কীটাণু কীট তুই, জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিব জ্ঞানে জীবের সেবা।

সবাই শুনলো ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের কথা গুলি। গূঢ় মর্ম বুঝলেন শুধু একজন। তিনি নরেন্দ্রনাথ। ঘরের বাইরে এসে তিনি বলে ছিলেন, কি আশ্চর্য কথাই না আজ শুনলাম ঠাকুরের শ্রীমুখে। লাখ কথার এক কথা।

শুষ্ক কঠোর বেদান্ত জ্ঞানকে ভক্তির সঙ্গে মিলিয়ে কি সহজ, সরল ও মধুর জ্ঞানের কথাই না তিনি বললেন। সর্বজীবে ঈশ্বরজ্ঞান-এই পরম শিক্ষাই সেদিন পেয়েছিলেন ভবিষ্যতের বিবেকানন্দ তাঁর মহান্ গুরুর কাছ থেকে। সাধে কি তিনি তাঁকে পরে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার বলে প্রচার করতেন?

নয়

গঙ্গার তীরে পানিহাটি।

প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে বৈষ্ণবদের একটা মেলা হয়ে থাকে! আনন্দের মেলা। হরিনামের হাট-বাজার বসতো। শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভু এই মেলার প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন। একসময়ে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শিষ্যগণ পরিবৃত হয়ে পানিহাটিতে এলে ভক্ত রঘুনাথদাস গোস্বামী চিড়ে, দই, দুধ, শর্করা, মর্তমান কলা প্রভৃতি দিয়ে এক ভোজের আয়োজন করেন। সেই ভোগ তিনি তাঁর ইষ্ট দেবতাকে প্রথমে নিবেদন করলেন। তারপর দিলেন নিত্যানন্দ প্রভুকে। ভোজন শেষ হওয়ার পর পরম তৃপ্তিলাভ করলেন নিত্যানন্দ। যাবার সময় বলে গেলেন, রঘুনাথ তুমি শীঘ্র সংসার ত্যাগ করে নীলাচলে যেও।

বৈষ্ণব ভক্তগণ তাঁর কথা স্মরণ করে, সেই থেকে প্রতিবছর ঐ দিনটিতে পানিহাটি গ্রামে গঙ্গাতীরে সমাগত হয়ে নিতাই ও গৌরাঙ্গের উদ্দেশে ঐ রকম উৎসবের আয়োজন করতেন। এই উৎসব আজও হয়। এরই নাম পানিহাটির 'চিড়ের মহোৎসব।' রামকৃষ্ণ

দেব পানিহাটির মহোৎসবে অনেকবার যোগদান করেছিলেনে। কিন্তু শেষের দিকে কয়েক বছর যাবৎ তিনি ঐ উৎসবে যেতে পারেন নি। এ বছর (১৮৮৫) তিনি তাঁর ভক্তদের সঙ্গে ঐ উৎসব দর্শনে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

১৮৮৫ সালের শ্রাবণ মাস থেকে ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত হন। অসুখ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্র নিজে উপস্থিত থেকে তাঁর চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করেন। ক্রমে রোগের বৃদ্ধি হয়। কলকাতা থেকে আসেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। আসেন রাখাল ডাক্তার। কিছু দিন কথা বলা নিষেধ। পানিহাটির উৎসবে যোগদান করলে অসুখটা যদি আবার বাড়ে, সেই কথা চিন্তা করেই কয়েকজন ভক্ত ঠাকুরকে উৎসবে যেতে নিষেধ করলেন।

ঠাকুর নিষেধ শুনলেন না। বললেন, এমন আনন্দের মেলা তোরা তো কখনো দেখিস নি ; চল্, দেখে আসবি।

—কিন্তু আপনার যে রকম অসুখ, তাতে এ বছর নাই বা গেলেন।

—কিছু হবেনি। এখান থেকে সকাল সকাল ছুটি খেয়ে যাব, আর দু'একঘন্টা কাল সেখানে থেকে ফিরে আসব।

—যদি সেখানে গিয়ে ভাব-সমাধি হয় আপনার ?

—তাহলে গলার ব্যথাটা বাড়তে পারে বটে, তখন একটু সামলে চললেই হবে।

তাঁর ঐ রকম কথায় সকল ওজর আপত্তি ভেসে যায়। ভক্তরা তাঁর পানিহাটির যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। এই তাঁর শেষবারের মতো পানিহাটির উৎসবে যোগদান। স্ত্রী-পুরুষ ভক্তরা শ্রীমাকে মেলায় নিয়ে যাবার জন্য ঠাকুরকে বললেন। তিনি কোন আপত্তি করলেন না। তবে এত ভীড়ের মধ্যে সারদাদেবীর যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। তিনি গেলেন না। রামকৃষ্ণ একাই গেলেন ভক্তদের নিয়ে। দক্ষিণেশ্বরে থেকে মেলায় যোগদান করতে। রামকৃষ্ণ আসছেন শুনে সমবেত বৈষ্ণব মহাজনদের মনে সে কী উল্লাস।

কীর্তন গানে মুখরিত উৎসব মণ্ডপে ঠাকুর বসলেন ভক্তদের সঙ্গে। সামলে চলবেন বলেছিলেন বটে কিন্তু মহোৎসবে কীর্তন শুনে তাঁর হয় ভাবাবেশ। এক পা, দু'পা চলেন, আবার ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। সেদিনের কথা স্মরণ করে একজন ভক্ত লিখেছেন :

'ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের শরীরে সেই দিন যে দিব্যোজ্জল সৌন্দর্য দর্শন করিয়াছি সেইরূপ আর কখনো নয়ন গোচর হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। দেব দেহের সেই অপূর্ব শ্রী যথাযথ বর্ণনা করা মনুষ্য শক্তির পক্ষে অসম্ভব। ভাবাবেশে দেহের কতদূর পরিবর্তন নিমেষে উপস্থিত হইতে পারে একথা আমরা ইতিপূর্বে কখনো কল্পনা করি নাই। তাঁহার উন্নত বপু প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্ন-দৃষ্ট শরীরের ন্যায় লঘু বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল; ভাবপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া চারিদিক আলোকিত করিয়াছিল এবং মহিমা করুণা শান্তি ও আনন্দ পূর্ণ মুখের সেই অনুপম হাসি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জনসাধারণকে কিছুক্ষণের জন্য সকল কথা ভুলাইয়া তাঁহার পদানুসরণ করাইয়াছিল। উজ্জ্বল গৈরিক বর্ণের পরিধেয় গরদখানি ঐ অপূর্ব অঙ্গকান্তির সহিত পূর্ণ সামজস্যে মিলিত হইয়া তাঁহাকে অগ্নিশিখা পরিব্যাপ্ত বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল।'

পানিহাটি থেকে ফিরে আসার পর রামকৃষ্ণের শরীর দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়লো। দিব্য প্রকাশ হওয়ার পর থেকে ভক্তদের দক্ষিণেশ্বরে আসা-যাওয়ার বিরাম ছিল না। এদের সকলের সঙ্গে প্রায় এক যুগ ধরে একাদিক্রমে একইভাবে কথা বলতে হয়েছে তাঁকে। কথা নয় কথামৃত। গলার অসুখটা প্রধানত এই কারণেই হয়েছিল। এক সময়ে যিনি কথা বলার জন্য মানুষ খুঁজে অস্থির হয়েছিলেন আর যে জন্য মায়ের কাছে আবদার করেছিলেন—সেই তিনিই এখন যেন অতিষ্ঠ হয়ে জগন্মাতাকে অভিমানের সুরে বলতে লাগলেন, মা, এত লোক কি আনতে হয়? একেবারে ভীড় লাগিয়ে দিয়েছিস। লোকের

ভীড়ে নাইবার সময় পাই না। একটা তো এই ফুটো ঢাক। রাতদিন এটাকে বাজালে আর কদিন টিকবে? আবার কত এঁদো লোককেও এখানে আনলি। এক সের দুধে একেবারে পাঁচ সের জল।

তবু কথা বলতে হয় তাঁকে।

তাঁর শ্রীমুখের কথা না শুনলে কারো কি তৃপ্তি হয়?

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গিরিশ ঘোষ, মহেন্দ্র মাস্টার এদের তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, তোমরা এদের সঙ্গে কথা বল। আমি একটু নিষ্কৃতি পাই। কিন্তু নিষ্কৃতি কে দেবে তাঁকে? তিনি যে এসেছেন যত মত তত পথ এই মহান বাণী প্রচার করতে। কিন্তু এখনকার অবস্থায় কথা বলা মানেই তো রোগের বৃদ্ধি। বিশ্রাম নেই, ভাব মুখেও কথার শেষ নেই। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন রামকৃষ্ণ বললেন, যে দিন এই দেহটাকে অনেক লোক দেবজ্ঞানে ভক্তি পূজা করবে, তখনই এর অন্তর্ধান হবে।

উৎকণ্ঠিত হন সকলে।

গলদেশে ক্ষত হয়েছে, বললেন চিকিৎসকগণ। ঠাকুরের সম্বন্ধে তদারক আরম্ভ করলেন ভক্তগণ। কিন্তু সে কথা শোনে কে? সকলেই তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন চিকিৎসকদের নির্দেশ মেনে চলার জন্য। একদিন গিরিশচন্দ্র দেখতে এসে বললেন, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন কিছুদিন একটু সাবধানে থাকুন তাহলেই সেরে উঠবেন।

—ডাক্তারদের সব কথা মেনে কি থাকা যায়? এই ছাখ দেখি। তুই বাগবাজার থেকে আমাকে দেখতে এলি, আর আমি তোর সঙ্গে একটিও কথা কইব না। তা কি হয়?

—আপনাকে দেখলেই আনন্দ হয়। কথা নাই বা কইলেন।

—তোদের যে কষ্ট হবে আমার মুখ থেকে একটি কথা না শুনলে।

—আমাদের কোন কষ্ট হবে না। ভাল হোন, আবার কত কথা শুনব।

কিন্তু সে কথা শোনে কে? ডাক্তারের নিষেধ, ভক্তদের অনুরোধ। নিজের কষ্ট—সব কিছু ভুলে গিয়ে তিনি আগের মতো ভক্তদের সঙ্গে আলাপ করতে থাকেন। বিরামহীন, বিশ্রামহীন সেই ঈশ্বরপ্রসঙ্গ। তারপর পানিহাটির মহোৎসবে যোগদান করে ঠাকুরের গলার বেদনাটা বেড়ে গেল। সেদিন আবার ফিরবার পথে বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছিল। গলায় প্রলেপ লাগিয়ে ঘরের মধ্যে ছোট তক্তপোষ খানির ওপর চুপ করে ঠাকুর বসে আছেন। এমন সময় এলেন একজন ভক্ত। প্রণাম করে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কি হয়েছে?

—এই ছ্যাখনা, ব্যথা বেড়েছে, ডাক্তার বেশি কথা বলতে নিষেধ করেছে।

—সেদিন আপনি পেনেটি গিয়েছিলেন, আমার মনে হয় সেজন্য ব্যথাটা বেড়েছে।

—ডাক্তার যদি ভাল করে বারণ করতো তাহলে আমি কি সেখানে যাই? সরল মনে বলেন রামকৃষ্ণ।

ক্রমে আঠার মাস অতীত হলো। বেদনার উপশম হয় না। কোন শক্ত খাবার গলা দিয়ে আর নামে না। দুধ-ভাত ও সুজির পায়স মাত্র খেয়ে ঠাকুরকে দিন কাটাতে হয়। দশ বছর আগে ১৮৭৫ সালে সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর থেকেই চলেছে হাজার হাজার ধর্মপিপাসুর কাছে বিরামহীন কথামৃত বিতরণ। বিলিয়েছেন সুধা আর নিজে কণ্ঠে ধারণ করেছেন গরল। নীলকণ্ঠ সাধক আজ তাই রোগজর্জর শরীরে বলছেন। কথা না বলে কি থাকতে পারি? মানব কল্যাণে কী অপরিসীম করুণা। মানবপ্রেম আর ঈশ্বরপ্রেম তাঁকে নীরব থাকতে দেয় না।

১৮৭৫। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি।

ভক্তগণ ঠাকুরকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে এলেন। দক্ষিণেশ্বরের এতদিনের আনন্দের হাট ভেঙে গেল। বলরাম-ভবনে কিছুদিন থাকার পর শ্যামপুকুর স্ট্রীটে একখানি পরিচ্ছন্ন বাড়িতে তাঁকে

রাখা হলো। কবিরাজী চিকিৎসা হবে, ঠিক হলো। কলকাতার বিখ্যাত গঙ্গাদাস কবিরাজ এলেন ঠাকুরকে দেখতে। কিন্তু কবিরাজী চিকিৎসায় রোগের উপশম হয় না। তখন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ মহেন্দ্রলাল সরকার চিকিৎসার ভার নিলেন।

একদিন মহেন্দ্র ডাক্তার এসে পরমহংসদেবকে পরীক্ষা করতে করতে বলেন, এসব আপনারই খেলা বলে মনে হচ্ছে।

—আমার নয় গো, এসব তাঁরই ইচ্ছায়।

কলকাতায় এসে ঠাকুরের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হলো না। কিন্তু মনের আনন্দ ও প্রসন্নতা এতটুকু কমেনি। শ্যামপুকুরের বাড়িতে সারদাদেবীকেও আনা হয়েছে। তা নইলে তাঁর পথ্যের দেখাশুনা করবে কে? এক মহল বাড়ি; বাড়িতে অপরিচিত পুরুষদের অবিরাম যাওয়া-আসা, তাঁর একার কত না অসুবিধা। তবু সব অসুবিধা তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়; স্বামীর পরিচর্যায় মন-প্রাণ ঢেলে দেন। তাঁকে রোগমুক্ত করার আশায় বুক বেঁধে তিনি দিনের পর দিন একভাবে কাটিয়ে দিতেন। এমন নীরবে নিঃশব্দে থাকতেন যে, যারা প্রত্যহ এখানে আসা-যাওয়া করতো তাদের অনেকেই জানতে পারতো না যে, সারদাদেবী ঠাকুরের সেবাকার্যের ভার নিয়ে এখানে রয়েছেন।

সেবার ভার নিয়েছেন স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ।

তিনি এখন রাত্রিবেলায় এখানেই থাকেন। তাঁর দেখাদেখি রাখাল, কালী, তারক, শশী প্রভৃতি গুরুভাইরা তাঁদের শ্রীগুরুর সেবায় নিজেদের সমর্পণ করেছেন। বাড়ি ছেড়ে তাঁরা সকলেই এখন এখানে থাকেন। রামকৃষ্ণের অলৌকিক মহিমা তাঁদের প্রাণে যে দিব্য আশা, আলোক, আনন্দ ও শান্তির ধারা প্রবাহিত হয়েছিল, কেবলমাত্র তারই প্রেরণায় তাঁরা ভবিষ্যতের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করে ঐ কাজে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

কার্তিক মাস। কালীপূজোর দিন এগিয়ে আছে।

ঠাকুরের শরীরের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি দেখা গেল না। প্রথম প্রথম চিকিৎসার একটু ফল পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সেটা স্থায়ী হলো না। বরং সকলের মনে তখন আশঙ্কা জাগল যে ব্যাধি প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। শ্যামপুকুরের বাড়িতে কালীপূজো হয়, এমন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ঠাকুর। ভক্তদের মধ্যেও কারো কারো ইচ্ছা যে, প্রতিমা এনে পূজো করা হয়। কিন্তু পূজোর হাঙ্গামায় পাছে ঠাকুরের শরীর আরো অবসন্ন হয়ে পড়ে সেইজন্য তাঁরা এই প্রস্তাব বর্জন করলেন।

পূজোর আগের দিন। রাতে ঠাকুর নিজেই বলে বসলেন, কাল রাতে কালীপূজো করতে হবে। সব যোগাড় করে রাখিস। ঠাকুরের নির্দেশ অমান্য করা সহজ নয়। ভক্তগণ পূজোর আয়োজনে প্রবৃত্ত হলেন। ঠাকুর যে ঘরটায় থাকতেন সেই খানেই খানিকটা জায়গা ধুয়ে-মুছে পূজোর উপকরণ সাজিয়ে রাখা হলো। পূজো ষোড়শো-পচারে হবে কি পঞ্চোপচারে হবে, অন্ন ভোগ দেওয়া হবে কি না, পূজকের পদ কে গ্রহণ করবে—এইসব বিষয়ের কোন মীমাংসা করতে না পেরে অবশেষে স্থির হলো, গন্ধপুষ্প, ধূপদীপ, ফলমূল, ও মিষ্টান্ন মাত্র সংগ্রহ করে রাখা হোক। পরে ঠাকুর যেমন বলেন, তেমন করা যাবে।

কার্তিকী অমাবস্যা রজনী! আজ দীপান্বিতা—আলোয় আলো হয়ে উঠেছে মহানগরী। সন্ধ্যা বেলা। নিত্যসঙ্গী ভক্তগণ ছাড়াও, বাইরের অনেক ভক্তও একে একে উপস্থিত হয়েছেন। ঠাকুররের ঘরে গোল হয়ে সবাই বসে আছেন। জন ত্রিশ লোক হবে। সকলের দৃষ্টি ধ্যানমগ্ন রামকৃষ্ণের দিকে নিবদ্ধ। থরে থরে পূজার উপকরণ সজ্জিত। সকলেই ভাবছেন ধ্যান ভাঙলেই ঠাকুর পূজায় বসবেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, ঠাকুরের ধ্যানভঙ্গের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। ভক্তগণ উদ্বিগ্ন হন।

হঠাৎ ভক্ত-ভৈরব গিরিশ উঠে দাঁড়ালেন। ফুলের থালা থেকে

চন্দন-চর্চিত পুষ্প, বিল্বপত্র, জবা তুলে নিয়ে, 'জয় মা' মন্ত্রে ঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে লাগলেন। তাঁর এই কাণ্ড দেখে সবাই স্তব্ধ, অভিভূত হলেন। পরমুহূর্তেই তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন ঠাকুরের ধ্যান ভেঙেছে। তাঁর মুখখানি জ্যোতির্ময় আর অপরূপ এক হাসির আলোকে উদ্ভাসিত। হাত দুটি বরাভয় দেওয়ার ভঙ্গীতে লীলায়িত। সকলেরই মনে হলো ঠাকুরের পবিত্র দেহকে আশ্রয় করে ভক্তের সামনে আবির্ভূতা হয়েছেন দিব্য জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রতিমা! মানবদেহ মিলিয়ে গেছে শূন্যে।

শত বিদ্যুতের প্রভা নিয়ে জ্বল্‌জ্বল করছে কালীমূর্তি। সেই মূর্তির পদযুগলে বারংবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করছেন গিরিশ। তখন ভক্তগণ সকলেই সেইভাবে অঞ্জলি প্রদান করলেন। গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে মাতৃনামের জয়ধ্বনিতে। সারা পল্লী মুখরিত হয় সেই রবে। পূজা শেষ হলো। ভক্তগণ স্বহস্তে নিবেদন করলেন ঠাকুরকে ফল ও মিষ্টান্ন। গ্রহণ করলেন তিনি প্রসন্ন মনে। তারপর তাঁর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করে সবাই ধন্য হলেন।

শ্যামপুকুরের বাড়িটি এখন দেবমন্দিরে পরিণত হয়েছে। পরমহংস-দেবের অসুখটা যেন একটা গৌণ ব্যাপার— ছলনামাত্র! আসল কথা হলো ঈশ্বরের কথা আলোচনা আর সংঘ গড়া। দলের পর দল লোক আসে। তারা ফিরে যায় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অমৃতরস পান করে। সে অমৃত পরিবেশন করেন পরমপুরুষ বিরামহীন ভাবে। তাই রোগ যেমন তেমনই রয়ে গেল। শরীরও শীর্ণ হয় দিন দিন। খাওয়া নেই বললেই হয়—সকালে ভাতের মণ্ড, ঝোল ও দুধ; সন্ধ্যায় দুধ ও যবের মণ্ড। মহেন্দ্র ডাক্তার একদিন পরামর্শ দিলেন, কলকাতার বাইরে কোথাও খোলা জায়গায় ঠাকুরকে নিয়ে গেলে ভালো হয়।

তাই হলো। শ্যামপুকুরের বাসায় শীতের মুখে রোগ খুব বেড়ে গেল। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি রামকৃষ্ণকে কাশীপুরে গঙ্গার তীরে একখানি বাগান বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। তাঁর সেবা করবার জন্য

সঙ্গে এলেন সারদাদেবী, গোলাপ মা, লাটু, নিরঞ্জন, কালীপ্রসাদ আর নরেন্দ্রনাথ। দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনেই বাগান। ওপরের গোল ঘরটিতে ঠাকুরের থাকার ব্যবস্থা হলো। দক্ষিণদিকের গাড়ি-বারান্দার ছাদে দাঁড়িয়ে তিনি বাগানের শোভা দেখতেন। বাগান ও তার নীচে গঙ্গা দেখে তাঁর কী আনন্দ। বাগানের পূর্বদিকে একটা পুকুর। পুকুরে শান-বাঁধানো ঘাট। ভক্তরা কখনো কখনো এইখানে বসে নিজেদের মধ্যে ঠাকুরের কথা আলোচনা করতেন।

আট মাস কাল রামকৃষ্ণ বাস করেছিলেন কাশীপুরের এই বাগান বাড়িতে। ব্যাধি বেড়েই চলেছে। তাঁর সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীরকে জীর্ণ ভগ্ন করে শুষ্ক কঙ্কালে পরিণত করে দিয়েছে। কিন্তু মন তাঁর আগের মতোই আছে—আগের মতোই তিনি তাঁর আরব্ধ কাজ করে চলেছেন। রোগশয্যায় শায়িত রামকৃষ্ণের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল একজনের ওপর। তিনি তাঁর মানসপুত্র নরেন। একদিন নিভৃতে তাঁকে বললেন, মা তোকে তাঁর কাজ করবার জন্য এই সংসারে টেনে এনেছেন, তুই যাবি কোথায়? আর একদিন বলেছিলেন, এইসব ছেলেদের ভার তোর ওপর দিয়ে যাব। আমি যখন থাকব না, তখন তুই এদের চালাবি।

পৌষের শীতের রাত্রি।

চারদিক নীরবতায় ঝিমঝিম করছে।

ওপরে অনন্ত আকাশ যেন হাজার নক্ষত্রের চোখ দিয়ে নীচের পৃথিবীকে দেখছে। নরেন্দ্রনাথ বাগানে পায়চারি করছেন। সঙ্গে কয়েকজন গুরুভাই। তাদের তিনি বললেন, আমার মন বলছে, ঠাকুরের যে ভীষণ ব্যাধি। তিনি দেহরক্ষার সংকল্প করেছেন। সময় থাকতে তোরা তাঁর সেবা ও ধ্যান-ভজন করে যে যতটা পারিস আধ্যাত্মিক উন্নতি করে নে।

পৌষ মাস শেষ হয়ে গেল।

এলো ইংরাজী নতুন বছর। ১৮৮৬।

শ্রীরামকৃষ্ণের ইহ জীবনের শেষ বৎসর।

পয়লা জানুয়ারি। অফিসের ছুটী। গিরিশ প্রমুখ ভক্তরা এসেছেন। ঠাকুর বসে আছেন তাঁর ঘরটিতে। পরনে লালপেড়ে কাপড়, গায়ে সবুজ রঙের বনাতের জামা, মাথার টুপিও সবুজ রঙের বনাতের, কান পর্যন্ত ঢেকেছে। পায়ে মোজা। শুধু খোলা মুখখানাই দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ গিরিশের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঠাকুর হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেন, আমাকে তোমার কি মনে হয়?

নতজানু হয়ে গিরিশ বললেন, ব্যাস, বাল্মিকী, শুকদেব যাঁর মহিমা বর্ণনা করতে অপারগ আমি তাঁর কথা কি বলব?

গিরিশের কথা শুনে ঠাকুরের সমাধির অবস্থা দেখা দিলো। ভাবমুখে বলেন, তোমাদের আর কি বলব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক।

ক্রমে শীত কেটে গেল। গ্রীষ্ম এলো, বর্ষাও যায় যায়। শ্রাবণ মাসে ঠাকুরের রোগ খুব বেড়ে গেল। রোজ গলা দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। দেহ নির্জীব—একেবারে কঙ্কাল সার। উঠবার সামর্থ্য নেই। সেদিন সকালে গলাদিয়ে অবিরাম রক্ত পড়ছে। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখের সামনে একটি পাত্র ধরে রয়েছেন। এমন সময় রামকৃষ্ণ হাঁপাতে হাঁপাতে ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন, জীব, আমি যে তোর জন্য এত রক্ত ঢাললাম, তুই আমার কি করলি?

ঠিক সেই সময়ে পাত্র হাতে উপবিষ্ট নরেন্দ্রনাথের মনের মধ্যে জেগেছে এক তীব্র সংশয়: একবার নিজের মুখে বলে যাও তুমি অবতার, তাহলে মানবো, নইলে মানবো না।

অমনি অন্তর্যামী পরমপুরুষ রক্তবমি করতে করতে তাঁর শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানি তুলে চোখ দুটি প্রিয়তম সন্তানের দিকে মেলে ধরে বলে উঠলেন, এখনো তোর সন্দেহ? যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং এই দেহে সেই-ই রামকৃষ্ণ।

সকল সংশয়ের অবসান হলো আজ নরেন্দ্রনাথের।

আর একদিন। ঘরে কেউ নেই, শুধু ঠাকুর আর নরেন্দ্রনাথ। তাকে কাছে ডেকে, তার হাত দুখানি নিজের শীর্ণহাতে নিয়ে, ধীরে ধীরে তিনি বলেন—নরেন। আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতে অনেক কাজ করবি।

১৮৮৬, ১ ই আগষ্ট। শ্রাবণ সংক্রান্তি।

রাত দুটো। ঘর নিস্তব্ধ। ঠাকুর নীরবে শুয়ে আছেন। স্তিমিত নয়ন। কোথায় কাশীপুর আর কোথায় দক্ষিণেশ্বর। ভবতারিণী দেবী কি আজ তাঁর প্রিয়তম সন্তানের শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছেন? মায়ের সন্তান আজ কি মায়ের ধ্যানে ডুবে গেলেন? সহসা গৃহের নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়। উদাত্ত কণ্ঠে ঠাকুর বলে উঠেন—কালী! কালী! কালী! রোগে জীর্ণ ক্ষীণ কণ্ঠের উচ্চারণ নয়, এ যেন সেই আগের উদাত্ত কণ্ঠ। এমন কণ্ঠস্বর ভক্তগণ ঠাকুরের কণ্ঠে অনেকদিন শোনেন নি। সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন, রোগ পাণ্ডুর সেই মুখখানি একটা দিব্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। চোখ দুটিতে ঝরছে প্রেমের ধারা—দৃষ্টি নাকের ডগায়। সমস্ত শরীর নিস্পন্দ।

মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। সেই সমাধি আর ভাঙল না। আকাশে চাঁদ, সহস্র নক্ষত্র শোভা পাচ্ছে—শুধু পৃথিবী আজ অন্ধকার। অন্ধকার নেমে আসে ভক্তদের মনে, তাঁর সন্তানদের মনে।

শতাব্দীর পটে এক অপার্থিব লীলার অবসান হলো।

কাশীপুরের মহাশ্মশানে যে দেবদেহ সেদিন ভস্মীভূত হয়েছিল, সেই আধারে যিনি একদা এই পৃথিবীতে বিরাজমান ছিলেন, তিনি আজ নেই। কিন্তু আছে তাঁর লীলার সৌরভ। আছে লীলার সৌন্দর্য—আছে পরমপুরুষের অমৃত বাণী। যুগযুগ ধরে সেই বাণীই পৃথিবীর নরনারীকে দেবে সত্যপথের সন্ধান। তোমরা বড় হয়ে যখন সেই বাণী পাঠ করবে, গ্রহণ করবে তার মর্ম তখন তোমাদের অন্তর বলে উঠবে:

তোমার বাণী তাপিত জীবনে পীযূষ ধারা।
তাই তো বিশ্বভুবন সে-বাণীতে আত্মহারা॥

— * —

রামকৃষ্ণ বাণী

[১]

ঈশ্বরদর্শনই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বর এক কিন্তু তাঁর মূর্তি নানা রূপ। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। জগৎ চৈতন্য তিনি। তিনিই মানুষ হয়ে যুগে যুগে আসেন।

[২]

ঘরে আলো প্রবেশ করলে যেমন মুহূর্ত মধ্যে যুগান্তরের অন্ধকারও বিদূরিত হয় তেমনি ভগবানের একটু মাত্র কৃপাকটাক্ষে সহস্র সহস্র জন্মের পাপ দূর হয়ে যায়।

[৩]

ভগবানকে ধ্যান করবে কোণে, বনে ও মনে। ঈশ্বরের রাজ্যে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক-একটা উপায় দেখিয়ে দিচ্ছে।

[৪]

ঘরে যদি আলো না জ্বলে সেটি দারিদ্র্যের চিহ্ন। তাই হৃদয় মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালতে হয়। শুধু পাণ্ডিত্য মিথ্যা—দরকার সাধনা বিবেক ও বৈরাগ্য।

[৫]

সংসার কর্মভুমি। এখানে কর্ম করতে আসা। পিপঁড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো পিপঁড়ে হয়ে শুধু চিনি টুকু নেবে। সর্বদা সৎ ও অসৎ বিচার করবে।

[৬]

অহঙ্কারই বিনাশের কারণ। অহঙ্কার ত্যাগ না করলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না।

[৭]

বালকের মতো বিশ্বাস চাই। বালক মাকে দেখার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এর পরেই ঈশ্বর দর্শন। ব্যাকুলতা থাকলে সব মত, সব পথ দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

[৮]

সংসারে থাকতে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। সত্যবাদী না হতে পারলে ঈশ্বর চিন্তা পর্যন্ত মিথ্যা হয়ে যায়।

———



শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণের হস্তাক্ষর

